ব্যাবিলন কথকতা

১৫ তম সংখ্যা

২২ ডিসেম্বর ২০২০

BABYLON

NEWGEN TECHNOLOGY LTD.
BABYLON RESOURCES LTD.

LearnersCafe
Learning Management System

PROTTAY
Number One Garments ERP

ERP

HR & PAYROLL
INVENTORY
MERCHANDISING
FINANCIALS AND ACCOUNTING
PRODUCTION MANAGEMENT
COMMERCIAL MANAGEMENT

OPERATION OFFICE

Floor–7A, House 3/1,
Block F, Lalmatia,Mohammadpur,
Dhaka 1207

+88 (02) 9015165, 9015348,
+8809609003306

www.brlbd.com
www.newgen-bd.com

CORPORATE OFFICE

Address: 2-B/1, Darussalam Road,
Mirpur, Dhaka 1216, Bangladesh.
Phone: +88 (02) 8023495-6, 8023462-3
8034266, 9015165, 9015348

VIDEO CONFERENCING SOLUTION

- Screen Sharing
- Meeting Scheduling
- Compatible Across Devices
- Chat Features
- Inter Connecting Options
- Remote Control
- Controls For Meeting Hosts
- Unlimited Recording
- White Board

We became Champion in Indigenous Service Category of Basis National ICT Award for 'Learnerscafe' in 2019.

We became Champion in Supply Chain Category of Basis National ICT Award for 'Prottay ERP' in 2018.

ডিসেম্বর ২২, ২০২০

সম্পাদক
এসএম এমদাদুল ইসলাম

সহ-সম্পাদক
রুমানা আক্তার

বিশেষ সহযোগিতা
শাহজালাল মিয়া পলাশ
মো. খোন্দকার মশিউর রহমান
আরিফ হোসেন

প্রচ্ছদ
মাহবুব শিপু

অলংকরণ
শ্রী সাগর কুমার

সার্বিক শিল্প নির্দেশনা
এসএম এমদাদুল ইসলাম
রুমানা আক্তার

সহযোগিতা
ব্যাবিলন পরিবার

মুদ্রণ
অক্ষর প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিসার্স
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
৮৬২২৯০১, ০১৯৩৬-১৫৬১০০

BABYLON

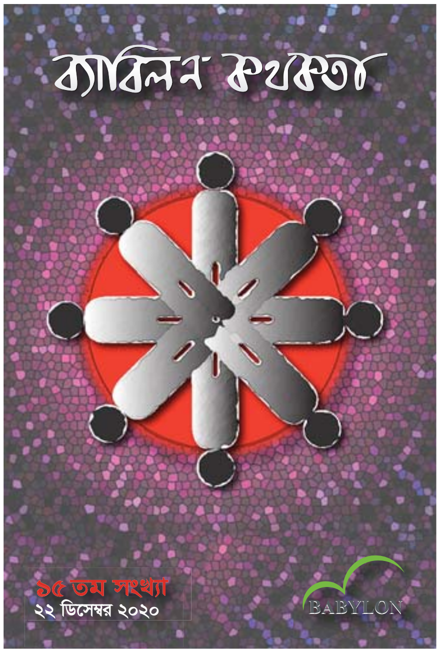

সূচিপত্র

শুভেচ্ছা বাণী		৪
সম্পাদকীয়		৫
জহিরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া	নাজমুল হুদা আহমদ	৯
জঙ্গলে বসবাস	প্রদীপ কুমার দত্ত	১৬
বশির সাহেবের মেজাজ	এসএম এমদাদুল ইসলাম	১৯
ব্যাবিলন কথকতার ১৪তম সংখ্যা প্রকাশ	সাইদুর রহমান	২৫
যাযাবরের অনুভাবনা	মাহমুদ আলম সিদ্দিকি	২৯
করোনার আঘাতে জাগ্রত চেতনা	মুহাম্মদ সাইফুল হক	৩৩
রোদেলা স্বপ্ন	মাহমুদ হোসাইন	৩৫
মনে রেখো	কাজী মহিউদ্দিন	৪০
ব্যাবিলন	বৃষ্টি রানি	৪১
ডায়েরির পাতায় অপেক্ষা	ফরহাদ হোসেন নির্জন	৪২
প্রস্ফুটিত প্রত্যয়ন	সজীব কুমার সাহা	৪৩
সন্ধ্যার অভিসার	মো. শাহজালাল মিয়া পলাশ	৪৪
সীমানা ছাড়িয়ে	মো. গোলাম মাওলা	৪৫
প্রাক্তন	রুমানা আক্তার	৪৬
রহস্যময়ী নীলচোখ	মো. মহসীন	৪৯
Quality Management System		
এক জাদুর কাঠি	তানভীর হোসেন	৬০
প্রশান্তির নিঃশ্বাস	আব্দুল কাদির হোসেন	৬৪
ভাড়াটিয়াদের সাতকাহন	উম্মে সালমা ডালিয়া	৬৮
কোভিড-১৯ এবং আমাদের পোশাক শিল্প	এম এম তোফাজ্জল হোসেন	৭১
করোনা সন্দেহ	মো. আনারুল ইসলাম	৭৫

প্রেমের মহাকাব্য	সৈয়দ মাহাবুব মোর্শেদ	৭৬
তোমার অপেক্ষায় আছি	মোছা. হালিমা খাতুন	৭৭
মা	মোছা. বিউটি খাতুন	৭৮
স্বপ্ন বিভোরে তুমি	শাহনাজ পারভীন	৭৯
বাপের কাছে ছেলের চিঠি	মো. খোরশেদ আলম	৮০
করোনা সংক্রমণ	নীলা খাতুন	৮১
জন্মদাত্রী মা	মো. রেজওয়ানুল হক রাইজু	৮২
সবুজ ও প্রকৃতির ভালোবাসার কাব্য	আব্দুল্লাহ আল মামুন	৮৩
না বলার সীমা নির্ধারণ করতে জানা	কাজী তৌহিদুল ইসলাম	৮৬
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলে	নাসরিন আক্তার	৮৯
শিয়াল বাবা কি জন্মদাতা বাবার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ	মো. মাহমুদ বিন এখলাছ (শাওন)	৯৬
ব্যাবিলন একটা ব্র্যান্ড	কাজী মাইনুল হোসেন	৯৮
আকুতির নিয়তি	আবু তালেব	১০২
সাদা পায়রা	আরিফ হোসেন	১০৪
এসো নামাজ পড়ি	মো. জসিম উদ্দিন জীবন	১০৮
পিকনিকে	মো. আমিনুল ইসলাম	১০৯
ব্যাবিলন	মো. ফিরোজ হাসান	১১০
রক্ত নদীর ধারা	মো. ছাদিকুল ইসলাম	১১১
ছন্দ	মোছা. মুন্নি আক্তার ময়না	১১২
স্বার্থ	মারুফা আক্তার	১১৩
করোনা ভাইরাস	মো. বাপ্পি মোড়ল	১১৪
চিত্রকর্ম		১১৫-১১৬
Photo Album		১১৭-১২০

শুভেচ্ছা বাণী

আনিসুল হক

ব্যাবিলন গ্রুপের ‘কথকতা’র প্রকাশনা উৎসবের মঞ্চে গিয়ে বসে বসে কত কথাই না ভাবছিলাম। একটা হলো, ‘কথকতা’ শব্দটি। এই শব্দ কতদিন ধরে কতবার ব্যবহার করেছি, কিন্তু শব্দটার দিকে ভালোভাবে দৃকপাত তো করিনি। কথকতা নাকি কথোকথা। নাকি কতকথা? কথকতাই এই সংকলনটার নাম, কিন্তু কতকথা শব্দও ব্যবহার করা যাবে, মানে কত রকমের কথা। আর কথা ও উপকথা মিলে তৈরি করতে পারে কথোপকথা। যেমনঃ কথোপকথন।
বিশ্বাস করুন, ব্যাবিলন গ্রুপের যে অনুষ্ঠানে আপনারা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে মঞ্চে বসেই আমি এসব ভাবছিলাম। আর ওই কথাটাও ভাবছিলাম। বলেওছি নিশ্চয়ই। কবি নির্মলেন্দু গুণ ল্যাব এইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁকে দেখতে গিয়ে বলেছিলাম, এই যে একজন মানুষ একটা বড় হাসপাতাল বানান, আবার নানা রকমের শিল্প গড়েন, মানুষের কর্মসংস্থান হয়, মানুষ সেবা পায়, তার অবদান বড়, নাকি একজন কবির অবদান বেশি।

আপনাদের বেলাতেও একই কথা ভাবি। কত মানুষকে জীবিকা দিয়েছেন আপনারা। আবার এমন একটা সংগঠন গড়েছেন, প্রতিষ্ঠান গড়েছেন, যেখানে সবাই একই পত্রিকায় লেখেন, সেখানে কোনো স্তরভেদ নেই, সবাই কর্মী। ব্যাবিলন গ্রুপের এই যে ইতিবাচক চিন্তা, সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার প্রবণতা, সবাইকে এক কাতারে নিয়ে সামনে চলার উদ্যোগ– তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। ব্যাবিলন গ্রুপের সাফল্য কামনা করি। শিল্পোদ্যোক্তারা যদি সুন্দর সাফল্য পান, তা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সম্পাদকীয়

এই ২০২০ বছরখানাকে আমি বলছি বিষবিষ বছর, বিশবিশ যেন শুধু নয়। স্বভাবতই কভিড - ১৯ প্রসঙ্গ চলে আসে। এই ২০২০ সালে গোটা দুনিয়ার নভেল করোনা ভাইরাস এর নভেলটি ছাড়া আর কী নিয়েই বা ভাববার আছে? বছরের শুরুর দিকে চীনের আলিবাবাখ্যাত জ্যাক মা'র একটা কথা আরো অনেকের মতো আমিও শিরোধার্য করেছি নিজের জন্য। করোনা নিয়ে কোনো ঘ্যানঘ্যানানি নয়, হাহুতাশ নয়, মরা কান্না নয় – এই বিষবিষ বছরটা হলো দাঁত কামড়ে পড়ে থাকার বছর, টিকে থাকার বছর। টিকে থাকতে পারলে এক সময় গাছের পড়ে থাকা শুকনো গুঁড়িতেও সবুজ পাতার উঁকিঝুঁকি অপ্রত্যাশিত নয়।

বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত সময় নিয়ে কতোকিছুই না বলার ও শোনার আছে। এ এক আরব্যরজনি যেন আমাদের সবার জীবনে – এই গল্প গল্পহিসেবে বলার বা শোনার জন্য একটা হাজার রাত যথেষ্ট নয়। আর এসব গল্প হবে কাল্পনিক কোনো শেহেরজাদীর কাছ থেকেও নয়। আমরা সবাই বাস্তবে সারা জীবনের জন্য এই সময়ের এক অমূল্য স্বাদ নিয়ে চলেছি। সেই সব গল্প অনেক লেখা হবে। বেঁচে থাকলে সময় করে তা আমরা পড়েও নেব – সামনের ব্যাবিলন কথকতার সংখ্যায় আমরাও নিশ্চয় লিখবো কতো কী।

এ বছরের মার্চ মাসে দেশে ভাইরাসটি এলো। ইয়োরোপ আমেরিকা হয়ে বাংলাদেশে আসতে দেরিই করলো যেন ব্যাধিটি। ফলে আমাদের মনে হয়েছিলো করোনা ফরোনা ওসব আমাদের কিছু নয় – সব বড়োলোকদের রোগ। পরে বাস্তবে অবশ্য চিত্র একটু একটু করে পাল্টে গেলোই। জাতির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য আক্রান্ত হয়ে যাওয়া ঠেকানো গেলো না কোনো মতেই। তবে পরে যা দেখলাম তাতে মনে হয়েছে দেশের মানুষের স্বভাবজাত সংগ্রামী চেতনা ও মনোভাব আজকের এই করোনা রোগ মোকাবেলায় কী দারুণভাবেই না কার্যকর হয়েছে, হচ্ছে তা শুধু বিস্ময়কর বললেও কম বলা হবে। এখানে জাতি হিসেবে প্রশংসা আমাদের প্রাপ্য। এটা ডিসেম্বর, বিজয়ের মাস। স্পিরিটটা ওখানেই আছে। আমরা আবার উঠে দাঁড়াবো।

২০২০ এর শুরুটা কিন্তু বেশ ভালোভাবেই হয়েছিলো আমাদের ব্যাবিলনের সার্বিক ব্যাবসার জন্য। যেখানে যেখানে দুর্বলতা ছিলো তা কাটিয়ে উঠতে পারার ইঙ্গিতও ছিলো সুস্পষ্ট। কিন্তু এটা একটা প্যানডেমিক পরিস্থিতি। গোটা বিশ্ব আক্রান্ত। আর পরিস্থিতি যখন চাচা আপন প্রাণ বাঁচা তখন আমাদের বিদেশি ক্রেতারা আগে তাদের ঘর সামলাবে পরে অন্যদের কথা ভাববে এটা অস্বাভাবিক নয়। তবে এদের ভেতর থেকে পার্থক্য আমরা পেয়েছি। কোনো কোনো বায়ার বা ক্রেতা সাধ্যের মধ্যে চেষ্টা করেছে, কেয়ার করেছে আমাদেরকে নিয়েই বাঁচতে। আবার কারো কারো ভেতরে নৈতিকতার বিষয়টা মোটেই প্রবল দেখিনি আমরা।

বছরের মাঝামাঝি এসে এক পর্যায়ে আমার মনে হয়েছিলো কথকতার প্রকাশ এবার সম্ভব হবে না। খুব নেগেটিভ চিন্তা ছিলো সেটা সন্দেহ নেই। ভেবেছিলাম আমাদের ব্যাবিলনের অন্যতম প্রধান একটা করোনা-বলি হতে যাচ্ছে এটি। যদিও এ বছর আমাদের ব্যাবসায়ী দেহে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে, অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ হয়েছে, তবে তার সবই ছিলো সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের ফসল। গোটা ব্যাবিলনের দেহটাকে রক্ষার জন্য এই সার্জারিটুকুর বিকল্প ছিলো না। তবে আমরা আবার সব ফিরে পাবো – বেশি করেই পাবো। বিশাল ব্যাবিলন টিমের নতুন পুরানদের অসাধারণ আত্মত্যাগ ও তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাসের পর মাস অমানবিক পরিশ্রম ও কর্মযজ্ঞে উপস্থিত থাকাটা, সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাওয়াটা কোনো মাপেই অসাধারণ থেকে কম নয়। এদের পুরস্কার একদিন মিলতেই হবে। আমার বিজনেস পার্টনাররা, গ্রুপ সিইও, গ্রুপ সিএফও, তাদের সঙ্গে বেশ ক'জন যোগ্য সহকারি, আমাদের প্রান্তিক ব্যাবসাগুলোর সিইও, সিওও রা – এরা আমাদের গর্ব। একদিন আমরা মহিউদ্দিন সাব্বিরদের নেতৃত্বে ও আমাদের বোর্ডের বিবেচক ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধানে ব্যাবিলনকে তার উপযুক্ত আসনে বসাবো। সেই দিনটি বেশি দূরে নেই মোটেই। দেশে ও বিদেশের ক্রেতাদের জন্য এক মুগ্ধ বিস্ময় তৈরি করবো আমরা। ভালোর জন্য পরিবর্তনে আমাদের আর জড়তা নেই। বরং আমরা এখন দুহাত প্রসারিত করেই আছি তার জন্য।

হ্যাঁ, পত্রিকার কথা বলছিলাম। টিম হিসেবে রুমানারাই আইডিয়াটা দিলো, মূলত আমাদের আইটির নক্ষত্র পলাশই ছিলো বিশেষ করে এরকম একটা নভেল আইডিয়া মাথা থেকে বের করার কারিগর। আমরা এবার এই বিশেষ করোনা সংখ্যাটিকে ইলেকট্রনিক প্রকাশের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারি। মন চাইলে ভবিষ্যতে এখান থেকে ছাপা সংখ্যা বের করাও সম্ভব হতে পারবে। কী অভিনব সুন্দর ও পজিটিভ আইডিয়া – বিশেষ করে আমার প্রায় হাল ছেড়ে দেবার মুহূর্তটিতে!

রুমানার অনেক দৃঢ়তার পরিচয় আমি এর আগে পেয়েছি। তবে এবারে এই পত্রিকাটির প্রকাশনা ঘিরে যা দেখলাম তা শুধু আমাকে না, পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট, যারা এটাকে কোনো পরিস্থিতিতেই হাত তুলে দিতে দেখতে চাননি তারা সবাই মেয়েটিকে নতুন করে চিনেছে। ওর সঙ্গের আরিফ ও মাহবুব শিপুর কথা সবাই জানে। আমার আলাদা করে বলার দরকার নেই।

পত্রিকাটির আভ্যন্তরিণ অলঙ্করণে আমরা এক নতুন প্রতিভা খুঁজে পেয়েছি নিজেদের

পরিবারের মধ্যেই। এতো ভালো ও বিষয়-প্রযোজ্য স্কেচ এতো দ্রুততার সাথে সে যে কী করে করে তা আমার কাছে এক বিস্ময়। ব্যাবিলন এগ্রিসায়েন্সের ডিজাইনার সাগর কুমারের কথা বলছি। সাগর আমাদের এক সম্পদ। ওর অনেক মঙ্গল হোক। ব্যাবিলনের এই সাহিত্যপত্রের চর্চাটাকে এই নিরন্তর লেগে থাকা এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে একদিন এক বিশাল উচ্চতায় নিয়ে যাবে তাতে আমাদের কারো কোনো সন্দেহ নেই।

বছরের শেষের দিকে এসে কভিড তার করাল থাবা আমার দিকে না বাড়ালে কতোকিছুই জানা, বোঝা হতো না। আমার জন্য আমার বিজনেস পার্টনার আবদুস সালাম, নিসার, আবিদ ও নান্নু ভাই সহ ব্যাবিলন, নন-ব্যাবিলন বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের দীর্ঘ খোঁজখবর নেবার মধ্যে যে আন্তরিকতা আমি টের পেয়েছি তা আমার সারা জীবনের সেরা প্রাপ্তির মধ্যে পড়ে। এর যোগ্য আমি নই, তাও ভালো লাগে। এতো মানুষ যে আমাকে মনে রেখেছে বা মনে রাখে এটা ভেবে আমি আপ্লুত – জীবন সার্থক মনে হয়। লোভনীয় এই পৃথিবীটা ছেড়ে যাবার আগে এদের সবার মঙ্গলের জন্য কিছু করে যেতে পারলে এদের প্রতি আমার দায় কিছুটা পূরণ হবে। (এখানে ভারতের রাধামনির সন্দীপের কথা অশেষ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। সন্দীপ আমার নিয়মিত খোঁজ নিয়েছে, নিচ্ছে যেন আমি তার আপন ভাই বা সেরকমই কিছু। বিপদে আপন মানুষ চেনা যায় – সেই ঈশপের গল্প। ক্রেতা ও ব্যাবিলনসুহৃদ মিস কোরিন ডোগরা, হ্যাঁ, অরিক্স কোম্পানির কোরিন ডোগরা – নিয়মিত ব্যাবিলনের খবর নিয়েছে সে এই করোনা পরিস্থিতিতে আমরা কেমন আছি, টিকে থাকার যুদ্ধে কতোটা মজবুত আছি, সাহস যুগিয়েছে আমাদের সবাইকে। এটাও অসাধারণ।)

চাইছিলাম না, তাও আবেগপ্রবণ হয়েই গেলাম। এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে এই কলমে আমার নিজের কথা নয়, ব্যক্তিগত বিষয় নয়, অন্য সবার কথাই বলার কথা।

রুমানা আক্তার তার স্বভাবসুলভ দৃঢ়তা নিয়ে এবারের ব্যাবিলন কথকতার ভার্চুয়াল সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান বাস্তবে হবে বলে জানিয়েছে। এই ক্ষেত্রে রুমানা দলছুট হয়নি কখনো। নাম উল্লেখ ছাড়াও অনুল্লেখিত অনেকেই এই কাজে রুমানাকে সহযোগিতা নিশ্চিত করে চলেছে। দল নিয়েই কাজ করেছে রুমানা এবং করছে। এদের সবার প্রতি রুমানার মতো আমরাও কৃতজ্ঞ।

মোড়ক উন্মোচন কীভাবে করা হবে তার ধারণা আমার এখনো নেই। এটা নিশ্চয় একটা অজ্ঞাত আনন্দ আমাদের জোগাবে। এই উদ্যোগটা সত্যি অসাধারণ ও সাহসী এক উদ্যোগ। গত সংখ্যার মোড়ক উন্মোচনে সাংবাদিক, সাহিত্যিক জনাব আনিসুল হক এসেছিলেন। মৃদুভাষী, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও বিবেচক মানুষটিকে আমাদের খুব ভালো লেগেছিলো তাঁকে ওই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে পেয়ে। তার শুভেচ্ছা বক্তব্য এই সংখ্যায় আছে। আশা করি সেটা পড়ে সবাই দারুণ অনুপ্রাণিত হবেন। আমি হয়েছি।

বাস্তবতার ধারা ও প্রয়োজন অনুসরণ করে এবছরও আমাদের পুরানো কিছু ব্যাবিলনিয়ান অন্যত্র চলে গিয়েছেন, সাথে শূন্যস্থান পূরণের লক্ষ্যে বেশ কিছু নতুন মুখ যোগ দিয়েছেন। এই প্রক্রিয়ায় অনেক আগে ব্যাবিলনের বিগত হয়ে যাওয়া কর্মীদের বেশ কিছু আবার ফিরেছেনও নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে। এদের সাফল্য ভীষণভাবে কাম্য। তাদেরকে কোম্পানিতে

সুস্বাগত জানাই। নতুন পুরান মিলে এখন আমরা একটাই পরিবার, ব্যাবিলন পরিবার। ভেদাভেদ কাম্য নয়, বরং তা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘ পরিসরে এরকম জোয়ার-ভাটা খুব স্বাভাবিক ও প্রয়োজনের তাগিদেই তা হয়। এই ডাইনামিজম ছাড়া কোম্পানি স্থবির হয়ে পড়ে, সামনের চ্যালেঞ্জ বুঝতে পারে না, পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে পিছিয়ে পড়ে। আমরা তা হতে পারি না। সামনে আমাদের অনেক কিছু, অনেক নতুন কিছু করার আছে ব্যাবসায়ের নতুন দিগন্ত ছোঁবার জন্য। সবাই মিলে আমাদের অদম্য দলটিকে নিয়ে আমরা তা পারবো। চেষ্টা আমাদের নীরলস। আমরা এগিয়েছি, পিছিয়ে যাবার আর উপায় নেই। ব্যাবিলন হবে দেশের এক গর্বের প্রতিষ্ঠান, আরাধ্য ও অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠান – এটা এখন অনেকটা আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যেই পড়ে। কভিড-১৯ আমাদের সবার মধ্যে অসাধারণ এক শক্তি, ঝুঁকি গ্রহণের অদম্য মনোভাব জুগিয়েছে। এই মনোভাবে সম্পৃক্ত আমাদের বোর্ডের সকল সদস্য। এটা একটা অভূতপূর্ব অর্জন। এই বিষয়টা কাজে লাগাতে হবে। আমরা নিশ্চয় তা করবো।

বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে গেছে, বিজয়ের মাস চলছে এখনো।

সবার জন্য শুভকামনা। বর্তমান সংখ্যার লেখক কলাকুশলীদের প্রতি ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও অপরিসীম শুভেচ্ছা।

টিকে থাকার বিষবিষ (২০২০) পার করেছি। সামনে ক'দিন পরে ২০২১ – পুনর্গঠনের বছর। ২০২২ হবে অসাধারণ সফল এক বছর – গোটা পৃথিবীর জন্য, দেশের জন্য, রেডিমেড গার্মেন্ট শিল্পের জন্য এবং আমাদের ব্যাবিলনের জন্য।

শুভ নববর্ষ ২০২১!

এসএম এমদাদুল ইসলাম
সম্পাদক
২২ ডিসেম্বর ২০২০

জহিরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া

নাজমুল হুদা আহমদ
গ্রুপ জিএম, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

১৯৯৪ সাল, তখন আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.বি.এ (সম্মান) তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। শাহজালাল হলে ২৩৭ নম্বর রুমে থাকি। লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুরের বিদ্যুৎ আমার রুমমেট। বিদ্যুৎ বি.বি.এ (সম্মান) প্রথম বর্ষের পরীক্ষার্থী। প্রথম বর্ষে তেমন একটা ক্লাস করেনি সে। তার ইচ্ছে ছিলো সেনাবাহিনীতে আই. এস. এস. বি দিয়ে কমিশন পদে নিয়োগ পাবার। এজন্য প্রচুর দৌড়ঝাঁপ ও প্রস্তুতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে তার প্রথম বর্ষের ক্লাস করা হয়নি। ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হওয়াতে সেনাবাহিনীতেও স্থান হলো না। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের পরীক্ষার সময় হয়ে এসেছে। চট্টগ্রাম শহরে তার এক চাচার বাসায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে আসতো। আমার এক বন্ধু রাজুর ছোট ভাই সাজুর মাধ্যমে বিদ্যুৎ এর সাথে আমার পরিচয়। ওরা দুজন রায়পুরের একই এলাকার বন্ধু ও স্কুল ক্লাসমেট। সেনাবাহিনীতে চান্স না পাওয়াতে বিদ্যুৎ এর মাঝে চরম হতাশা দেখে একদিন সাজু আমাকে বিদ্যুৎ এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো। আমাকে সাজু এমনভাবে অনুরোধ করলো যাতে আমি বিদ্যুৎকে আমার রুমে রেখে পড়াশুনাতে সহযোগিতা করি এবং ওকে ভালো করে একটু পড়িয়ে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করি। আমার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার জন্য কোনোভাবেই আমি রাজি হচ্ছিলাম না কিন্তু সাজু ছিলো নাছোড়বান্দা। এরই মাঝে কথায় কথায় জানতে পারলাম বিদ্যুৎ এর বাবা ছোটবেলায় মারা গেছেন। ছেলেটির জন্য খুব মায়া হলো। আমিও এক প্রকার রাজি হয়ে গেলাম। আমার পরীক্ষার প্রস্তুতির পাশাপাশি বিদ্যুৎ এর পরীক্ষার জন্য তাকেও বিশেষ নজর দিয়ে পড়াতে লাগলাম। আমার টার্গেট ছিলো ও যাতে পরীক্ষায় সকল বিষয়ে ন্যূনতম পাস করে। বিদ্যুৎ এর চেষ্টারও কমতি ছিলো না। যথাসময়ে পরীক্ষা শেষে বিদ্যুৎ পরীক্ষায় খুব ভালো করলো। পরীক্ষা শেষে ও আমার রুম থেকে চলে যাওয়ার কথা থাকলেও যেতে চাইল না। কেন জানি আমার ওপর ওর বিশ্বাস বেড়ে গেল। অনেক অনুরোধ করে আমার সাথে থেকে ভালো পড়ালেখার জন্য হলে থেকে যেতে চাইলো।

বিদ্যুৎ এর কাছ থেকে জানতে পারলাম ওর এক ভাগিনা আছে যার নাম জহির উদ্দিন

(পরান)। এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি দুই পরীক্ষায় রায়পুরে থেকে প্রথম শ্রেণীতে পাস করেছে। জহিরের খুব ইচ্ছা ছিলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.বি.এ তে পড়বে। কিছুদিন আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.বি.এ প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিলো কিন্তু সফল হতে পারেনি। এ কারণে জহির গ্রামে তার বাড়িতে খুব হতাশায় দিন কাটাচ্ছে। বিদ্যুৎ আমাকে মাঝে মাঝে জহিরের চিঠি পড়ে শুনাতো। এক ইদের ছুটিতে লক্ষ্মীপুর বিদ্যুৎদের বাড়িতে বেড়াতে গেলে জহিরের সাথে আমার পরিচয় হয়। তখন ছেলেটির মাঝে অনেক হতাশা দেখি এবং তাকে পরবর্তী বছর ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে বলি। ইদের ছুটি শেষে বিশ্ববিদ্যালয় খুললে জানতে পারি, সে বছর বানিজ্য অনুষদের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে তদন্ত কমিটি ভর্তি পরীক্ষা পুনরায় গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেছে। আমি এবং বিদ্যুৎ সাথে সাথে জহিরের স্বপ্ন পূরণের ক্ষেত্রে আশার আলো দেখতে পেলাম। তখন মোবাইলের যুগ ছিলো না। চিঠির মাধ্যমে আমারা বিষয়টি জহিরকে জানাই এবং পত্র পাওয়া মাত্র তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসতে বলি। চিঠি পাওয়ার পর সম্ভবত পরীক্ষার ৩-৪ দিন আগে বাড়ি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের উদ্দেশে রওনা দেয় জহির।

একদিন আনুমানিক ৮.৪৫ মিনিটে রাতের খাবারের জন্য আমি হলের ডাইনিংয়ে ছিলাম। রাতের খাবারের মেন্যু কী তা দেখছি, এমন সময় আমাকে নাজমুল ভাই বলে কে যেন পেছন থেকে ডাক দিলো। পেছন ফিরে দেখি খুবই বিধ্বস্ত অবস্থায় জহির দাঁড়িয়ে। ওর চেহারাতে কোনো হাসি নেই। প্রচণ্ড ভয়ের একটি ছাপ। 'কেমন আছো' জিজ্ঞাসা করতেই সে জানালো তার সব স্বপ্ন শেষ। চট্টগ্রাম থেকে রাত ৭ টার ট্রেনে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ফিরছিলো। সিটে বসে মাথার ঠিক উপরের দিকে তার ব্যাগটি রেখেছিলো। কে বা কারা তার ব্যাগটি চুরি করে নিয়ে গেছে। সেই ব্যাগে তার ভর্তি পরীক্ষার মূল এডমিট কার্ড, এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি দুই পরীক্ষার মার্কসিটের মূল কপি, স্কুল ও কলেজের মূল সনদ, মানিব্যাগসহ টাকা ও কিছু কাপড়-চোপড় ছিলো।

উল্লেখ্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনে রাতে কোনো বাতি থাকে না। চট্টগ্রাম স্টেশনে যখন ট্রেন দাঁড়ানো থাকে তখন বিভিন্ন টোকাই, ছিনতাইকারি, গাঁজা সেবকদের বেশ আনাগোনা থাকে। তারা সুযোগ বুঝে চুরি, পকেট সাফাই, ছিনতাই ইত্যাদি অপকর্ম করে সুকৌশলে সটকে পড়ে। আমার আর বুঝতে বাকি রইলো না যে, জহির রাতের ট্রেনে ক্যাম্পাসে ফিরতে গিয়ে সব খুইয়েছে। সে টোকাই, ছিনতাইকারি, গাঁজা সেবকদের অপকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলো না। অগাধ বিশ্বাসে তার ব্যাগটি ট্রেনে উঠে রাতের অন্ধকারে সিটের উপরে রেখেছিলো। আমার কিঞ্চিত সন্ধেহ হলো, সে হয়তোবা সারাদিন বাসে ভ্রমণ করে কিছুটা ক্লান্ত ছিলো, যে কারণে সে হয়তোবা ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সেই সুবাদে যারা অপকর্ম করার, তারা সুযোগ বুঝে কাজ সেরে নিয়েছে।

খাওয়া বাদ দিয়ে জহিরকে নিয়ে আমি রুমে যাই। বিদ্যুৎ এর সাথে তার দেখা হয়। জহির

কান্নায় ভেঙে পড়ে, তার ভর্তি পরীক্ষা দেবার সুযোগ হারিয়ে ফেলার জন্য। তার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্নের বুঝি এখানেই সলিল সমাধি হলো! জহিরের কাছে ভর্তি পরীক্ষার এডমিট কার্ড, এস.এস.সি. ও এইচ.এস.সি. দুই পরীক্ষার মার্কশিটের কোনো ফটোকপিও ছিলো না।

জহিরের কষ্ট দেখে খুব খারাপ লাগলো। কী করা যায় তা নিয়ে খুব চিন্তা হলো। বিদ্যুৎ আমাকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলো কিছু একটা করা যায় কি না। আমি বিদ্যুৎকে বললাম আগে জহিরকে নিয়ে রাতের খাবার খেয়ে নিই। এর মাঝে কিছু একটা করা যায় কি না চিন্তা করে বের করতে হবে।

হলের ডাইনিংয়ের খাবার শেষ হয়ে যাওয়ায় আমরা হলের বাইরে হোটেলে রাতের খাবার খেতে গেলাম। জহির তেমন কিছুই খেতে পারল না। প্রথম পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাবতে লাগলাম যদি জহির ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চায় তাহলে প্রথমে তার এডমিট কার্ডের অনুলিপি লাগবে এবং ডিন অফিস থেকে তা সংগ্রহ করতে হবে। জহিরকে জিজ্ঞেস করলাম তার ভর্তি পরীক্ষার রোল নাম্বার মনে আছে কি না। সে জানাল তার মনে আছে। এডমিট কার্ডের জন্য জহিরের ছবি লাগতে পারে কিন্তু জহির কিংবা বিদ্যুৎ কারো কাছে তা নেই। তখন ক্যাম্পাসে কোনো স্টুডিও ছিলো না। এদিকে অনেক রাত হয়ে গেছে। যদি ছবি তুলতে হয় তাহলে চট্টগ্রাম শহরে যেতে হবে, নয়তো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিন কিলোমিটার দূরে হাটহাজারী বাজারে যেতে হবে। ততক্ষণে সব বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকে ভর্তি পরীক্ষার আর মাত্র দুই দিন বাকি আছে। শহরে গিয়ে ছবি তুলে আনতে গেলে একদিন পার হয়ে যাবে। ততক্ষণে ডিন অফিস বন্ধ হয়ে যাবে। পরীক্ষার একদিন আগে এডমিট কার্ডের অনুলিপি নাও দিতে পারে। এই ভেবে ঠিক করলাম খুব সকালে জাহিরকে নিয়ে হাটহাজারী বাজার যাবো এবং স্টুডিও খোলার সাথে সাথে ছবি তুলে জরুরি চার্জ দিয়ে কম সময়ের মধ্যে ওর ছবি নিয়ে আসবো। এতে সময় বাঁচবে এবং অফিসে ডিন স্যারের সাথে দেখা করে অনুরোধ করবো জহিরকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেবার জন্য।

পরদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি জহিরকে নিয়ে আমি আর বিদ্যুৎ রিক্সা যোগে আমরা ঘণ্টা খানেকের মধ্যে হাটহাজারী বাজারে পৌঁছলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমরা একটা স্টুডিওর সন্ধান পেলাম কিন্তু সেটি বন্ধ ছিলো। আশেপাশের দোকানে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, স্টুডিও সকাল ১০ টার আগে খুলবে না। আমাদের হাতে তখনও এক ঘণ্টা সময় ছিলো। আমরা এদিক-সেদিক ঘুরাঘুরির পর দোকানের সামনে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সময় যেন কিছুতেই কাটছিলো না। অবশেষে স্টুডিও মালিক ১০টা নাগাদ দোকান খুললে আমরা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচি! সাধারণ চার্জের অতিরিক্ত টাকা দিয়ে জরুরি ডেলিভারির জন্য জহিরের ছবি উঠানো হলো। এক ঘণ্টা বসে আমরা ছবি ডেলিভারি নিলাম। মুখ গোমড়া করে থাকা সেই সাদাকালো ছবিটি জহিরের জীবনে আজো ইতিহাস হয়ে

আছে।

দুপুর ১২টা নাগাদ ছবি নিয়ে আমরা বানিজ্য অনুষদে পৌঁছলাম। ছবিটা আগে সত্যায়িত করাতে হবে। জহিরের কেউ পরিচিত না থাকায় আমি আমার বিভাগের সওকতুল মেহের স্যারের কাছে গেলাম সত্যায়িত করাতে। স্যার বললেন, তিনি অপরিচিত কারো ছবি সত্যায়িত করেন না। স্যারকে অনেক অনুরোধ করে জহিরের বিপদের কথা বলে ছবিগুলো সত্যায়িত করালাম।

অনেক আশা আর দুরু দুরু মন নিয়ে এবার জহিরকে নিয়ে ডিন অফিসে গেলাম। তখন ডিন ছিলেন আমার বিভাগেরই সিনিয়র প্রফেসর নুরুউদ্দিন স্যার। স্যার আমাদের এন্টাপ্রিনারশিপ ডেভেলপমেন্ট বিষয় পড়াতেন। আমি ক্লাস ক্যাপ্টেন ছিলাম বলে স্যার আমাকে ভালো করে চিনতেন। স্যারকেও অনেক অনুরোধ করে জহিরের বিপদের কথা খুলে বললাম। স্যার সাথে সাথে ডিন অফিসের পিওনকে ডাকলেন এবং জহিরের ভর্তি পরীক্ষার রোল নাম্বার, নাম, পিতার নাম একটি কাগজে লিখে দিতে বললেন ও আমাদের অপেক্ষা করতে বলেলেন। গাদা গাদা ভর্তি ফর্মের বান্ডেল থেকে অফিস পিওন জহিরের ফর্মটি খুঁজে ডিন স্যারকে দিলেন। স্যার জহিরের ভর্তি ফর্মের সাথে লাগানো ছবির সাথে জহিরের চেহারা মেলালেন এবং অন্যান্য তথ্য চেক করলেন। সব তথ্য সঠিক পেয়ে স্যার একটি ডুপ্লিকেট এডমিট কার্ড ইস্যু করলেন। নতুন করে তোলা ছবিতে স্যার স্বাক্ষর ও সিল দিয়ে দিলেন। এডমিট কার্ড হাতে পাওয়ার পর জহির, আমার আর বিদ্যুতের খুশির সীমা রইল না। মনে হলো জহিরের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার স্বপ্ন এক ধাপ এগিয়ে গেল।

জহিরের ভর্তি পরীক্ষার আর মাত্র দুই দিন বাকি। আমি আর বিদ্যুৎ জহিরকে রাত আর দিন সম্ভাব্য পরীক্ষার সকল প্রস্তুতির জন্য কোচিং দিতে লাগলাম। বলা যায় দ্রুত কিছু বিষয়ে টিপস দিলাম। ওর চেষ্টারও কোনো কমতি ছিলো না, কারণ এই যুদ্ধে যে তাকে জিততেই হবে। অবশেষে মাহেন্দ্রক্ষণে জহির তার পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করল। আমরা অধীর আগ্রহে ওর পরীক্ষা শেষ হবার জন্য ফ্যাকাল্টির বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। পরীক্ষা দিয়ে বের হবার সময় ওর হাসিমাখা মুখখানা দেখে আমাদেরও আনন্দের সীমা ছিলো না। জহির পরীক্ষা খুব ভালো দিয়েছে। আগের দুই দিনে আমাদের দেয়া কোচিং ওর খুব কাজে দিয়েছে। জহির সহ আমি আর বিদ্যুৎ জহিরের স্বপ্ন পুরণের নেশায় একাত্ব হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু খুব টেনশন হচ্ছিলো– এবার জহির চান্স পাবে তো? তার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন সফল হবে তো?

পরীক্ষা শেষে এবার জহিরের বাড়ি ফেরার পালা। ফলাফল পেতে ১৫/২০ দিন লাগতে পারে তাই বাড়ি চলে যাওয়া। হঠাৎ মনে হলো যদি জহির পরীক্ষায় এবার টিকে যায় তাহলে বিভাগ নির্বাচনের সাক্ষাৎকারের সময় তার এস.এস.সি. ও এইচ.এস.সি. দুই পরীক্ষারই মূল

মার্কশিটের প্রয়োজন হবে, যা তার ব্যাগ চুরির কারণে হারিয়ে গেছে। যদি তা বোর্ড থেকে দ্রুত উঠানো না হয় তাহলে সে সাক্ষাৎকারে চান্স পাবে না এবং লিখিত পরীক্ষায় টিকে গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না। মূল মার্কশিট উঠাতে গেলে স্থানীয় থানায় জিডি করতে হবে, পত্রিকায় হারানো বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। এই জন্য জহিরের বাড়ি যাওয়া দুই দিন পিছিয়ে গেল।

পরদিন জহিরকে নিয়ে আমি আর বিদ্যুৎ হাটহাজারী থানায় গেলাম মার্কশিট হারানোর জন্য জিডি করতে। জিডি কপি সংগ্রহ করে চট্টগ্রাম শহরে গেলাম দৈনিক পূর্বকোন পত্রিকা অফিসে। নির্ধারিত ফি পরিশোধ করে পরদিন পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে জহির বাড়ি চলে গেল। বাড়ি যাবার সময় ওকে খুব তাগাদা দিলাম যাতে কুমিল্লা বোর্ড থেকে জরুরি ফি দিয়ে মূল মার্কশিটগুলো উঠিয়ে রাখে কারণ ও যদি ভর্তি পরীক্ষায় টিকে যায় তাহলে মূল মার্কশীট ছাড়া ভর্তির সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাবে না। জহির জানালো ওর বাবা রায়পুর বামনী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং স্কুলের বিভিন্ন কাজে বোর্ডে তাঁর জানাশুনা ও আসা-যাওয়া আছে। ফলে সে তা দ্রুত সংগ্রহ করতে পারবে।

পুনঃভর্তি পরীক্ষার প্রায় কুড়ি দিন পর ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হলে আমি আর বিদ্যুৎ ক্লাস বর্জন করে বানিজ্য অনুষদে গেলাম জহিরের রেজাল্ট দেখতে। অনেক ভিড়ের মধ্যে খুঁজে পেলাম জহিরের ফলাফল। জহির পুনঃভর্তি পরীক্ষায় সফলকাম হয়েছে। আমাদের যেন আনন্দের আর সীমা রইল না। আমার মনে হলো, আমি যেন আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছি।

এবার আরেক চ্যালেঞ্জ হলো জহিরের ভর্তির খবর গ্রামের বাড়িতে তাকে পৌঁছানো। তখন কোনো মোবাইল ফোন এদেশে আসেনি। রায়পুরের সেই বামনী গ্রামে কোনো টেলিফোনও ছিলো না। মাত্র তিন দিন আছে তার ডিন অফিসে ভর্তির সাক্ষাৎকারের জন্য। আমরা খুব টেনশনে পড়ে গেলাম। বিদ্যুতের ক্লাস টেস্ট থাকাতে সেও ঐ মুহূর্তে বাড়ি যেতে পারছিলো না। কী করা যায় এই নিয়ে বিদ্যুৎসহ সারাদিন ভাবতে ভাবতে একটা আইডিয়া পেয়ে গেলাম। জহিরদের বাড়ি রায়পুরে বাসে যেতে মূল সড়কে সর্দারবাড়ি নামে একটি জায়গা আছে যেখানে বাস থামে। সর্দারবাড়িতে একটি দোকান আছে এবং দোকানের মালিক হানিফ নামে একজন বৃদ্ধ লোক, যিনি জহিরদের বাড়ির পাশে থাকেন। আমরা চিন্তা করলাম– যদি কোনোভাবে আমরা হানিফ চাচাকে খবরটি পৌঁছাতে পারি তাহলে চাচা খবরটি জহিরদের বাড়িতে পৌঁছে দিবেন।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম থেকে যে বাসগুলো রায়পুরে যায় সেগুলোতে কোনো যাত্রী থাকলে সর্দারবাড়িতে থামে। আমরা চিন্তা করলাম যদি বাস ড্রাইভারকে ম্যানেজ করে তার মাধ্যমে একটি চিঠি সর্দারবাড়ির হানিফ চাচাকে এবং চাচার মাধ্যমে একটি চিঠি জহিরকে পৌঁছানো

যায় তাহলে জহির খবরটি দ্রুত পাবে এবং জহির তা পাওয়া মাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসবে। যেই ভাবা সেই কাজ। আমি আর বিদ্যুৎ একই রকম তিনটি চিঠি সর্দারবাড়ির হানিফ চাচাকে এবং তিনটি চিঠি জহিরকে লিখলাম। হানিফ চাচাকে চিঠিতে খুব অনুরোধ করলাম, তাদের বাড়ির কাছে থাকা জহিরের চট্টগ্রামে আসা খুবই জরুরি প্রয়োজন, এই খবরটি তিনি যাতে জহিরদের বাড়িতে গিয়ে ঐ দিনই পৌঁছান এবং সাথের চিঠিটিও যাতে জহিরের হাতে দেন। তিনটি চিঠি দেবার মূল কারণ ছিলো পর পর তিনটি বাসের মাধ্যমে এই খবর পৌঁছানো, যেন এক বাস ড্রাইভার চিঠি হস্তান্তর না করলেও অন্য ড্রাইভার হয়তো চিঠি হস্তান্তর মিস করবেন না।

পরদিন খুব সকাল বেলা আমরা ক্যাম্পাস থেকে চিঠি নিয়ে চট্টগ্রামের কদমতলি বাস স্টেশনে গেলাম, যেখান থেকে রায়পুরের বাস ছাড়ে। রজনীগন্ধা নামে কিছু ভালো বাস ছাড়ে রায়পুরের উদ্দেশে। আমরা প্রথম বাস ছাড়ার পূর্বে গাড়িতে উঠলাম, ড্রাইভারকে নিজেদের পরিচয় দিলাম এবং পুরো বিষয়টি বুঝিয়ে বললাম। একটি ছেলের জীবনে পড়ালেখা ও তার ভবিষ্যতের উপকারের জন্য অনেক অনুনয়, বিনয় করে তার সাহায্য চাইলাম। বাস ড্রাইভার আমাদের প্রতি সদয় হলেন এবং চিঠি দুটি বুঝে নিলেন।

প্রতি এক ঘণ্টা পর পর রায়পুরের বাস ছাড়ে। একই কায়দায় আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাস ড্রাইভারদেরও ম্যানেজ করে চিঠি হস্তান্তর করলাম। উল্লেখ্য বাস ড্রাইভারদের ম্যানেজ করার জন্য তখন তাদের পান কিনে দিয়েছিলাম। এভাবে আমরা প্রায় তিন/চার ঘণ্টা পর সেদিনের মিশন শেষ করে ক্যাম্পাসে ফিরলাম। সারাদিন-সারারাত আমাদের একটাই চিন্তা– বাস ড্রাইভাররা সর্দারবাড়িতে বাস থামাবে তো? হানিফ চাচা চিঠিগুলো পাবে তো? জহিরকে তার চিঠি ও খবরটি পৌঁছাবে তো? যদি এই চেষ্টা সফল না হয় তাহলে জহির সময়মতো জানতে পারবে না, তার ভর্তি পরীক্ষায় সফল হবার খবর। ভর্তির সাক্ষাৎকারের তারিখ অনুযায়ী আসতে না পারলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত হবে। তার স্বপ্ন সফল হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হবে। নানান দুশ্চিন্তায় আমাদের দিন পার হলো।

পরদিন ক্লাস শেষে রুমে ফিরে আমি আর বিদ্যুৎ জহিরের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম এবং তার পথপানে তাকিয়ে সময় কাটাচ্ছিলাম। কথা হচ্ছিলো যদি জহির কাল চিঠি বা খবর পায় তাহলে তার আজ এই সময়ের মধ্যে চলে আসার কথা। এমন সময় রুমের দরজায় কড়া নেড়ে উঠল। দরজা খুলতেই দেখি উৎফুল্লমুখে জহির। ওকে দেখে আমরা জড়িয়ে ধরলাম ও প্রবল আনন্দ উদযাপন করলাম। হ্যাঁ, সে গতকাল সর্দারবাড়ির হানিফ চাচার মাধ্যমে দুটি চিঠি পেয়েছে। খবর পেয়ে আজ সকালে খুব ভোরেই বাড়ি থেকে রওনা দিয়েছে।

জহিরকে নিয়ে খাওয়া দাওয়া শেষে বিকেলে ক্যাম্পাসে ঘুরাঘুরি করলাম। ভর্তির সাক্ষাৎকারের জন্য হাতে আরও একদিন সময় আছে। এর মধ্যে জহিরের কোন বিভাগ

পছন্দের তা জানলাম। তাকে বি.বি.এ. এর বিভিন্ন বিষয় ও ভবিষ্যৎ সুযোগ সুবিধার তুলানামূলক দিক বুঝাতে লাগলাম। তার বিপণনবিদ্যা বিভাগ প্রথম পছন্দের। আমরা তার পছন্দকে সায় দিলাম। যদি তার স্কোর ভালো থাকে তাহলে তার পছন্দের বিষয় পেতে কোনো সমস্যা হবে না বলে জানালাম। উল্লেখ্য গত ১৫ দিনে জহির তার বাবার মাধ্যমে কুমিল্লা বোর্ড থেকে জরুরি ভিত্তিতে এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি দুই পরীক্ষার অনুলিপি মার্কশিট উঠিয়ে এনেছে। এবার সে তা যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসেছে।

নির্ধারিত দিনে জহির তার প্রবেশ পত্র, এস.এস.সি. ও এইচ.এস.সি. পরীক্ষার অনুলিপি মার্কশিট নিয়ে সাক্ষাৎকার শেষ করল। দুই দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত ভর্তি তালিকা প্রকাশ করা হলো। জহির তার পছন্দ আনুযায়ী বিপণনবিদ্যা বিভাগ পেল। জহিরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন সত্যি হলো। সেদিন ছিলো আমার জীবনের অন্যরকম ভালোলাগার একটি দিন।

জঙ্গলে বসবাস

প্রদীপ কুমার দত্ত
প্রাক্তন ডিজিএম
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

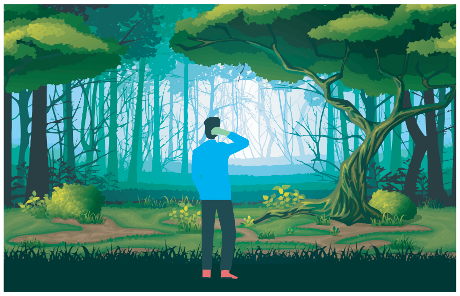

তমাল, বাদল, মানিক একসাথে বেড়ে উঠেছে গ্রামে। এদের বাড়ির পিছনেই খুব বড় জঙ্গল। জঙ্গলে রয়েছে ঝোপঝাড়, বাঁশ, গাছ, লতা পাতা, গুল্ম, অচেনা ওষধি। আছে ডোবা, বর্ষায় ডোবায় মাছও থাকে। সেথায় রয়েছে পোকামাকড়, সাপ, ব্যাঙ, পিঁপড়া, কেঁচো, গুই সাপ, শিয়াল, বন বিড়াল, কাঠবিড়ালি ও নানা রকমের পাখি, যেমন– ঘুঘু, ঢুপি, টিয়া, ময়না, চড়ুই, কাক, শালিক, আরও থাকে পতঙ্গ, বল্লা, ভিমরুল, মৌমাছির চাক।

এদের জঙ্গলের গভীরতা অনেক। আকারে অনেক বড়। দিনের বেলায়ও ঘুটঘুটে অন্ধকার থাকে। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দেখা যায় না। দশ গ্রামের মধ্যে এতো বড় আয়তনের জঙ্গল সচরাচর খুব একটা চোখে পড়ে না। অনেকে বলে থাকে ঐ জঙ্গলে ভূত থাকে। অবশ্য তমাল কখনো ভূত দেখে নাই এবং এসবে সে বিশ্বাসও করে না। চৈত্রের ভরদুপুর ঝি ঝি পোকারা এক অদ্ভুত টানে সারা দুপুর-বিকাল কখনো উচ্চ লয়ে আবার কখনো মৃদুলয়ে সুমধুর আবার কখনো চরম বিরক্তিকর আওয়াজ করতো, যা উচ্চাঙ্গ সঙ্গিতের রেওয়াজের মতো ভেসে বেড়াতো। এক শুকনো বাঁশের সাথে আরেক শুকনো বাঁশের ঘর্ষণে ক্যাঁচ ক্যাঁচ আউয়াজ করতো এতে ভয়ই পাওয়ার কথা। জনমানব শুন্য জঙ্গলে এমন আওয়াজ একরকম ভয়েরই উদ্রেক করে থাকে। কিন্তু তমাল, মানিকরা তাতে একদম ভয় পেতো না। তমালরা কৈশোরে প্রায়ই জঙ্গলে প্রবেশ করে পাখির বাসা থেকে পাখির ছানা ধরে আনতো। পোকা ধরে ধরে বাঁশের চোঙের মধ্যে ভরে ওগুলো পালা কবুতরের মতো ভেবে খেলা করতো।

ওরা জঙ্গল থেকে বাঁশের আগা কেটে এনে মাছ ধরার ছিপ বানাতো, জঙ্গলের মধ্যে মুরুব্বিদের আড়ালে সাথিদের নিয়ে বিড়িও ফুঁকতো। পাড়ার বড়দের মধ্যে কেউ কেউ তাসের আড্ডা জমাতো। কানাঘুষা শোনা যেতো– রাতের বেলায় মাঝে মাঝে দূর দূরান্ত থেকে ডাকাত দলের সদস্যরা এখানে একত্রিত হয়ে ডাকাতির পূর্ব পরিকল্পনা করতো। এ কারণে জঙ্গলের মাঝে জনমানব চলাচলের রাস্তা ও ছোট জমায়েতের চিহ্ন কোনো এক

জায়গায় স্পষ্টভাবে চোখে পড়তো। ছোট বেলা থেকে তমালের মাছ শিকারের নেশা ছিলো। মাছের খাবারের টোপ হিসেবে বল্লা, পিঁপড়া, ভিমরুলের ডিমের চাক জঙ্গল থেকে বন্ধুদেরকে সাথে করে খুঁজে বের করে নিয়ে আসতো। অবসর পেলেই সাথীদের নিয়ে ঘুরঘুর করতো সাপ, বনবিড়াল, শিয়াল– এসব প্রাণীকে সে একদম ভয় পেত না। ওর মা ওকে বারবার জঙ্গলে যেতে নিষেধ করতেন। কিন্তু সে সবরকম ভয়-ডর উপেক্ষা করে নির্বিকার ঘোরাফেরা করতো। একদিন তিন বন্ধুতে মিলে জঙ্গলের ভিতর একটা ডোবার পানি সেঁচে অনেক পরিশ্রম করে মাছ ধরে বাড়িতে নিয়ে আসে। মা জানতে চায় মাছ কোথা থেকে এনেছে? তমাল সরল জবাব দেয়, সে জঙ্গলের ডোবা থেকে ধরে এনেছে। মা তক্ষুণি রেগে-মেগে মাছগুলোকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তমাল কিছু বুঝে উঠার আগেই তার মা বকাঝকা শুরু করেন। মাছগুলো দেখে মা খুশীই হবেন, এমনটাই ভেবেছিলো তমাল। কিন্তু বিপরীতে মা যে এতোটা রাগ করবেন এটা বুঝতে পারেনি। মায়ের ক্ষুব্ধ আচরণে দুঃখ পেলেও পরে মা বুঝিয়ে বললে সে বুঝতে পেরেছিলো। নানা ছোট ছোট প্রাণীর গলিত মৃতদেহ পঁচে ডোবার পানিতে মিশে, মল-মূত্র মিশে পানি দূষিত হয়, সেই দূষিত পানির মাছ খাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

পাখির ছানা ধরা, বলার ডিমের চাক পাড়া, উঁই পোকার ডিবি খনন করে ডিম সংগ্রহ করা, বন জাম, লটকন, গোলাপ জাম, সুপারি গাছ থেকে সুপারি পেড়ে আনা এসব কাজে তার জুড়ি মেলা ভার। দেখা গেলো কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল পেকে আছে। পাখি ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে- অমনি দ্রুত পরনের লুঙ্গি কাছা মেরে লাফিয়ে লাফিয়ে গাছে চড়ে কাঁঠাল নামিয়ে আনতো সে।

আর একদিনের কথা; রাতের বেলায় বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। তমাল ঘরের পিছন দিক দিয়ে সোজা দৌড় দিয়ে জঙ্গলের ভিতর পালিয়েছিলো। ঘুটঘুটে অন্ধকার, রাত তখন প্রায় ২টা-৩টা বাজে, এর সাথে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। সব মিলে গা ছমছম করা এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ। ডাকাতরা তাদের মিশন শেষ করতে প্রায় একঘণ্টার উপর সময় নিয়েছে। ঐ সবটুকু সময় সে জঙ্গলের ভিতরেই ছিলো একা একা। এটা ছিলো তার জীবনে এক অভূতপূর্ব দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা। ডাকাতদল চলে গেলে তমাল বাড়িতে ফিরে আসে। এ সবই তমালের ছোটবেলার কথা, তখন সে স্কুলে পড়ে মাত্র।

মাধ্যমিক স্কুল পার হওয়ার পর পুরনো বন্ধুদের ছেড়ে এসে প্রথমে মফস্বলের মহকুমা শহরে এবং পরে রাজধানী শহর ঢাকায় চলে আসে উচ্চ শিক্ষার জন্য। দীর্ঘদিন শিক্ষা ও কর্মময় জীবনে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করলেও তার মন পরে থাকতো সেই অজপাড়া গাঁয়ের জঙ্গল ঘিরে এক সুপ্ত শিহরণে। তাইতো আজ পঞ্চাশ বছর পরে গ্রামে গেলে জঙ্গলটা দেখলে তার কাতর মন কেঁদে উঠে। জঙ্গলের আকার ক্ষীণ হয়ে আসছে। বড় গাছগুলো উজার হতে চলেছে। আগের সেই প্রানিকুল এখন আর নেই। যেমন সজারু, কচ্ছপ, এরা উধাও হয়েছে

অনেক আগেই। তবে নতুন করে উপদ্রব বেড়েছে জোঁকের, যা আগে কখনো ছিলো না। বিলুপ্ত হয়ে গেছে অনেক প্রজাতির গুরুত্বপূর্ণ গাছ ও গুল্মলতা। নাম না জানা অজস্র পোকা-মাকড়, পিপড়া, সাপ, গুইসাপ, পাখি, শিয়াল, কেঁচো, উইপোকা, জোঁক, ব্যাঙ, কেঁচো, এরা কোনোরকমে টিকে আছে নিরন্তর আগ্রাসী মনুষ্যকুলের সাথে লড়াই করে প্রকৃতির দয়ায়।

তমালের ইচ্ছা হতো যেটুকু জঙ্গল এখনো টিকে আছে সেগুলো পরিষ্কার করে পুণঃসংস্কার করে নতুন করে ফলের, বনের এবং ওষধি গাছ লাগাবে। কিন্তু প্রকৃতি প্রদত্ত প্রানিকুলের অভয়ারণ্যের কথা মনে হলেই তার আর জঙ্গল উচ্ছেদ করতে মনে সায় দেয় না। সভ্যতার বিকাশে আজ প্রকৃতি হুমকির সম্মুখিন। গাছ, বন, জঙ্গল, পাহাড়, নদী, সাগর সর্বত্র সম্পদ আহরণে এক হিংস্র প্রতিযোগিতা চলছে।

তমাল চায় যে কোনো মূল্যে আবহাওয়া, পরিবেশ, প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করে আগামি প্রজন্মের জন্য নিরাপদ আশ্রয় গড়ে তুলতে। সেজন্য তার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। তমালের একটাই চাওয়া ছোট-বড় সকল প্রাণি, সকল গাছ, লতাপাতা, গুল্ম, যে কোনো মূল্যে এদেরকে টিকিয়ে রাখতেই হবে।

বশির সাহেবের মেজাজ

এসএম এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক
ব্যাবিলন গ্রুপ

সব মানুষেরই এটা হয়, কখনো না কখনো। বদমেজাজের কথা বলছি। এরকম সময় জীবনে আসেই যখন মানুষ তার শান্তরূপ হারিয়ে ফেলে, ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মেজাজ, এমন সব কাণ্ড করে সে তখন যার জন্য কি না পরে তার নিজের কাছেই লজ্জা পেতে হয়। আমাদের এই গল্পের চরিত্র বশির সাহেব এইসব সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা। অসাধারণ মেজাজ খারাপের সুনাম (দুর্নাম?) তাঁর আছে। অফিসে, বাসায়, পাড়ায় সবাই তাঁর ভয়াবহ মেজাজের সাথে পরিচিত। কোনো ব্যাংকে উচ্চ পদে আসীন থাকায় তাঁকে সবাই উপরে উপরে সহ্য করে কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁর সমালোচনা হয় প্রচুর। বশির সাহেবের স্ত্রীর নাম ফরিদা। এই দম্পতির দুটি সন্তান – বড়োটি ছেলে, কলেজে যেতে শুরু করেছে – আর ছোটোটি মেয়ে, সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। ছেলে রাকিব স্বভাবে বাবার ঠিক উল্টো। শান্ত স্বভাবের রাকিব বাবার ভীষণ বদমেজাজ দারুণ অপছন্দ করলেও মুখ ফুটে তাঁকে কিছু বলতে সাহস নেই তার। মেয়ে আফসানা অবশ্য সেরকম নয়। ছোটো, তার উপর মেয়ে, বাবার সাথে এদের একটা আহ্লাদি সম্পর্ক থাকে। এরা বাবাকে ছোটোকাল থেকেই ভয় করতে শেখে না। মুখের উপর উত্তর করে, প্রতিবাদ করে। আফসানাও এর ব্যতিক্রম নয়। তা সত্ত্বেও সে হচ্ছে একটা বাচ্চা মেয়ে। নিরিহ স্ত্রী ফরিদাও স্বামীকে ভয় পান, মুখ বুজে সহ্য করেন বশির সাহেবের অযৌক্তিক মেজাজের ভয়াবহতা। চায়ের স্বাদ পছন্দ না হলে কাপ-পিরিচ ছুড়ে ফেলে ভাঙা, তরকারিতে লবন বা ঝাল বেশি হলে প্লেট ভাঙা – এগুলো এখন ফরিদার গা সওয়া হয়ে গেছে। কেন আমরা বশির সাহেবের বদমেজাজকে এত বড়ো করে দেখাচ্ছি সেটা বোঝা যাবে যদি দু'একটা উদাহরণ দেই।

একবার কোনো এক শীতকালে – পৌষ মাসের দিকে তিনি তার স্ত্রীর জন্য একটা দামি কাশ্মিরি শাল কিনে এনেছিলেন। শালটি খুব সুন্দর ছিল, কিন্তু ফরিদা সেই সময় রান্নাঘরে একটু ব্যস্ত থাকায় শালটি দূর থেকে দেখে – খুব সুন্দর হয়েছে, আমারতো আছে, আবার আনতে গেলেন কেন – জাতীয় কথা বলে আবার তার কাজে মন দিয়েছিলেন। স্ত্রীর এহেন নির্জীব সাড়া বশির সাহেবের প্রত্যাশা মোটেই পূরণ করেনি। তিনি আশা করেছিলেন ফরিদা এসে শালটি খুলে হাত দিয়ে ছুঁয়ে তার পরশ নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবেন। তাঁর মনে হলো শালটির মর্মার্থই বোঝেনি ফরিদা। এটি কেনাই হয়েছে ভুল। কাজেই তিনি নতুন শালটি সহ নিজের পুরোনো তিনটে আর পুত্র ও কন্যার চার থেকে পাঁচটা শাল বের করে নিয়ে বাইরে

চলে গেলেন। তারপর ওগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিলেন। এরপর সেই আগুনে শীতের আঁচ নিতে লাগলেন। পরে অবশ্য সবই নতুন করে কিনতে হয়েছিল তাঁকে।

আরেকটি ঘটনা একটা দামি ট্রানজিস্টর রেডিও নিয়ে। মাত্র কয়েক মাস আগে কেনা ছয় ব্যান্ডের রেডিওটাতে একদিন সমস্যা দেখা দিলো। রেডিওর প্রোগ্রামের আওয়াজের সাথে সারাক্ষণ একটা খরখরে আওয়াজ মিশে যায়। চড়-চাপড় দিয়েও কাজ হচ্ছে না। দিন দুই দেখে ছেলে রাকিবকে দিয়ে মেকানিকের কাছে পাঠালেন বেতার-যন্ত্রটা। দুদিনের কথা বলে সাতদিন পরে রেডিও ফেরত পাওয়া গেল। রাকিব রেডিও এনে বলল সব ঠিক হয়েছে এখন, আওয়াজে আর ঘড়ঘড় শব্দটা নেই আগের মতো – সে নিজে শুনে তবে মজুরি দিয়েছে মেকানিককে।

রাতে খাবারের পর বশির সাহেব রেডিও নিয়ে বসেছেন। (এই গল্প যেই সময়ের তখন টেলিভিশন ঘরে ঘরে হয়নি আর তার চ্যানেল মাত্র একটি – তাও দিনে-রাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য)। ভলিউমের নবটা দেখলেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, না, আওয়াজ ঠিক হয়েছে। তাঁর চেহারায় একটা সন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠল। এবার স্টেশন টিউন করার নব ঘুরিয়ে বি বি সি-র শর্টওয়েভ বাংলা অনুষ্ঠান ধরতে সচেষ্ট হলেন। এই স্টেশনটার আশেপাশে আরো অনেকগুলো কেন্দ্র থাকায় টিউন করতে সময় লাগে। অনবরত ডানে-বাঁয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে এক সময় নবটা খুলে নিচে পড়ে গেল। কপাল কুঁচকে ঝুঁকে মেঝে থেকে নবটা তুলে লাগাবার চেষ্টা করলেন। নাহ, শক্ত হয়ে লাগছে না। ধরলেই খুলে হাতে চলে আসছে। নবের ভিতরে পাতলা কাগজের প্যাকিং ঢুকিয়ে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। এরপর ছেলের কাছে সুপারগ্লু চাইলেন। দেখা গেল নেই তা ঘরে, বা থাকলেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মেজাজ চড়তে শুরু করেছে তাঁর। দরকারের সময় কোনোকিছু হাতের কাছে পাওয়া যাবে না এই হচ্ছে এ বাড়ির নিয়ম। তিনি মুখ খোলার আগেই ছেলে বেরিয়ে জলদি সুপারগ্লু কিনে আনতে গেল এবং মিনিট দশেক পরে তা নিয়ে ফিরেও এলো।

– আব্বা, আমি দেখি একটু? – ভয়ে ভয়ে বলল সে।

– না, তুমি পড়তে যাও। সাধারণ কাজ, আমিই পারব। বাবার এই গম্ভীর গলার সাথে রাকিব সুপরিচিত, কাজেই সে আর কথা বাড়ালো না।

নবের ভিতরে এই ভয়ানক আঠা লাগাতে গিয়ে বশির সাহেব হাত মাখামাখি করে ফেললেন একবারে, কিন্তু সুপারগ্লু লাগিয়েও নবটাকে জব্দ করা গেল না। হয়তো আঠা শক্ত হবার জন্য যথেষ্ট সময় দেয়া হয়নি। এই পর্যায়ে বশির সাহেব আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না। দামি মেইড ইন জাপান রেডিওটা তুলে জোরে এক আছাড় মারলেন মেঝেতে। এতে রেডিওটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়নি দেখে এবার ওর উপরে দাঁড়িয়ে নাচলেন কতক্ষণ। ব্যস, এ রেডিও এখন মেরামতের অযোগ্য হয়ে গেল। বাড়ির সবাই এতক্ষণ আতঙ্কের সাথে দেখেছে এই তাণ্ডব।

এরপর আরেকটা ঘটনা বলব যেটা এর চাইতেও ভয়াবহ।

বাসা তার অফিস থেকে দূরে না হওয়ায় বশির সাহেব দুপুরে খেতে বাসায় আসেন। একদিন

খাওয়া শেষ করে নির্ধারিত বিশ্রাম নিয়ে অফিসে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ওয়ালেট, সিগারেট লাইটার নিয়ে পকেটে পুরলেন, কিন্তু চাবির রিংটা খুঁজে পাচ্ছেন না। এখানে ওখানে সব জায়গায় খোঁজা হলো, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না সেটা। রাকিব, আফসানা বাসায় নেই, ক্লাসে। ফরিদাও খুঁজলেন সম্ভাব্য সব জায়গায়। কোনো ফল হলো না।

– অফিসে রেখে আসেন নি তো? খুব ভয়ে ভয়ে শুধোন ফরিদা স্বামীকে।

– অসম্ভব, কখনো এ ভুল হয় না আমার। কতো জরুরি চাবি ওটার মধ্যে। বলে চোখ-মুখ খিঁচিয়ে তাকান ফরিদার দিকে – যেন ফরিদা একটা কুৎসিত গালি দিয়েছেন তাঁকে। ফরিদা আর কিছু না বলে পাশের রুমে গিয়ে চাবির রিং খুঁজতে শুরু করলেন। পাওয়া গেল না। এদিকে বশির সাহেবের অফিসে ফেরত যেতে যত দেরি হচ্ছে ততই তার মেজাজ তিরিক্ষি হচ্ছে। এই সময় ফরিদা একটা প্লেটে পাকা আম কেটে নিয়ে এলেন স্বামীর জন্য। খাবার সময় দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। অমনি আগুনে ঘি পড়ল যেন। বশির সাহেব আমের প্লেটটা নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন ঘরের এক কোণে। সেটা গিয়ে পড়ল সেখানে কাঁত করে রাখা ক্যারম বোর্ডটার উপর। পাকা আমের টুকরো লেপ্টে রইল ঘিয়ে রঙের বোর্ডের এখানে সেখানে। সেই দৃশ্য দেখে বশির সাহেব ছুটে গেলেন রান্নাঘরে। হাতের কাছে পেলেন একটা দা। সেটা নিয়ে এসে ক্যারমবোর্ডটা হাতে নিয়ে ঠিক মাঝখানে বসিয়ে দিলেন এক ঘা। দায়ের অর্ধেকটাই প্রায় বোর্ডের ভিতরে সেঁধিয়ে গেল। বশির সাহেব দা ধরে টানতে থাকলেন আরেক কোপ বসাবার জন্য, কিন্তু দা-টা শক্তভাবে আঁটকে যাওয়ায় ওটা জোরাজুরি করেও বের করতে পারলেন না। তখন আরেক কাণ্ড করলেন তিনি। দা সমেত ক্যারমবোর্ডটা তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেলেন। বাসার অদূরেই একটা পুকুর। দা বুকে নিয়ে শিয়ালকোটের তৈরি সুন্দর ক্যারমবোর্ডটির সলিল সমাধি হলো। বলা বাহুল্য– চাবির রিং তাঁর অফিসেই পাওয়া গিয়েছিল সেদিনই বিকেলে।

এহেন বশির সাহেব একদিন আচমকা ভীষণ বদলে গেলেন। কোনো রকম আভাস ইঙ্গিত না দিয়েই তিনি হঠাৎ শান্ত স্বভাবের হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে দীর্ঘকালের পরিচিত মানুষেরা তাঁর এই আকস্মিক পরিবর্তনের কোনো মানে বা কারণ খুঁজে পেল না। কথায় কথায় যে মানুষটা অন্যের খুঁত ধরে বকাঝকা করেন, রেগে গিয়ে হাত-পা ছোড়েন, জিনিস-পত্র ছুঁড়ে মারেন – আজকাল তিনি এসব কিছুই করেন না। সবাই হতভম্ব – কী হয়েছে বশির সাহেবের? রাগ তো এখন উনি করেনই না, ওদিকে দয়া-মায়াও যেন বেড়ে গিয়েছে ওনার। নরম ও মিষ্টি করে কথা বলছেন সবার সাথে, একে ওকে বকশিশ দিচ্ছেন – যা আগে দিতেন না, রিক্সায় চড়লে দরাদরি করছেন না বরং শেষ অব্দি বেশি পয়সাই দিয়ে দিচ্ছেন রিক্সাওয়ালাকে। ফরিদা খুশি হবার পরিবর্তে উদ্বিগ্ন হলেন, ছেলে-মেয়েরাও চিন্তিত। পাড়া-প্রতিবেশীরা ভাবল এটা বশির সাহেবের আবার কোন্ কৌশল। যেদিন তিনি বাজার থেকে আসার সময় রাস্তায় কাকে তাঁর পরনের সোয়েটারটা দান করে এলেন সেদিন আর ফরিদা নিজেকে চেপে রাখতে পারলেন না।

– কী হয়েছে আপনার বলেন তো, কোনো অসুখ? সেরকমও তো মনে হয় না। তাহলে?

জবাবে বশির সাহেব একটুও রেগে গেলেন না। বরং গলায় একরকম আবেগ এনে স্ত্রীকে

বোঝালেন যে তাঁর কিছু হয়নি। যেটা হয়েছে সেটা হলো উপলব্ধি। তিনি এখন বেশ বুঝতে পারছেন যে এদ্দিন যেটা করে এসেছেন সেটা ভুল। অপরের সাথে, বিশেষ করে কাছের মানুষের সাথে রেগে চেঁচিয়ে কথা বলা, কটুক্তি করা, অকারণে বা অল্প কারণে উত্তেজিত হয়ে পাড়া মাত করবার কোনো অর্থ নেই। ব্যবহারেই মানুষের পরিচয়, ভালো ব্যবহারে তো পয়সা লাগে না। আর মানুষের দুঃখ-কষ্টে, বিপদে এগিয়ে যাবেতো মানুষই, ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব স্বামীর মুখ থেকে শুনে সুখে ও আনন্দে ফরিদা কেঁদে ফেললেন। তারপর যা করলেন সেটা তাদের বিবাহিত জীবনে তিনি কখনোই করেননি। স্বামীর মাথাটা টেনে নিয়ে তার ঠোঁটে টপ করে একটা চুমু খেয়ে ফেললেন। কাজটা করেই আবার ভয় পেয়ে গেলেন এই বুঝি স্বামী তার রেগে গিয়ে একটা কাণ্ড করে বসেন। কিন্তু না সেরকম হলো না, বরং বশির সাহেবকে বেশ খুশিই মনে হলো। সিলিঙের দিকে তাকিয়ে তিনি কী এক গভীর চিন্তা বা স্মৃতি রোমন্থনে মগ্ন হয়ে গেলেন। ফরিদা স্বামীর জন্য তার প্রিয় কোনো পদ রান্না করতে চলে গেলেন রান্নাঘরে।

আগে বিশেষ দরকার ছাড়া রাকিব, আফসানা বাবার মুখোমুখি হতে চাইতো না। এখন মাঝেমাঝেই নিজে থেকে ওরা বাবার সাথে এটা ওটা নিয়ে গল্প করতে আসে। বশির সাহেবের এই আকস্মিক পরিবর্তন পরিবারটিতে নিয়ে এলো এমন এক সুখ-শান্তি যার স্বাদ এর আগে এরা পায়নি। ফরিদা নিভৃতে নামাজ পড়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করেন – হে রহ্‌মানুর রাহিম, মানুষটাকে তুমি সুমতি দিয়েছ এজন্যে তোমার দরবারে আমার কোটি শুকরিয়া। তিনি দোয়া করেন এটা যেন কোনো সুখস্বপ্নের মতো আবার মিলিয়ে না যায়। না, এটা স্বপ্ন নয় মোটেই। বশির সাহেবের দিনকাল এভাবেই চলতে থাকলো। ইনি এখন রেগেও যান না আবার কোনো বিষয়ে তাঁর বিশেষ উচ্ছ্বাসও নেই। সময়ের সাথে সাথে সবাই ভুলে যেতে থাকলো যে একসময় বশির সাহেব দারুণ বদমেজাজি ছিলেন।

আরো ক'দিন পরের কথা। বশির সাহেব সেদিন একটু দেরি করে ফিরলেন বাসায়। না, অস্বাভাবিক কিছু নয়। এরকম দেরি আগেও মাঝেমাঝে হয়েছে তাঁর। ব্যাঙ্কার হয়েও উনি ক্লাবে যান না বা কাজের শেষে বাইরে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আড্ডা দেবার তেমন অভ্যেস তাঁর নেই। আসলে তাঁর মেজাজের কারণেই হয়তো বিশেষ কোনো বন্ধু হয়নি আজও। সাম্প্রতিক পরিবর্তনের পরে এতো অল্প সময়ে বন্ধু হবার কথাও নয়। কাজেই তারপরও মাঝে মাঝে তাঁর এই দেরি কেন এটা তাঁকে কেউ কখনো জিজ্ঞেস করেনি। পুরোনো ভয়টা যেন কোনো না কোনো ভাবে রয়েই গিয়েছিল।

সেদিন দেরি করে এলেও মনটা খুব ফুরফুরা ছিল বশির সাহেবের, কারণ ঘরে ঢুকেই হৈ চৈ লাগিয়ে দিলেন তিনি। স্ত্রীকে ডেকে বললেন – সবাই তৈরি হয়ে নাও আজ আমরা বাইরে খাবো।

– এখন বলছেন? আমিতো রান্না করে ফেলেছি !

– কিস্‌সু হবে না, যাও রেডি হও। রাকিব কোথায়? আফসানা, আফসানা।

– রাকিব পড়ছে আর আফসানা রূপাদের বাড়িতে।

– রূপাদের বাড়িতে? রূপা কে?

– আপনার কিছু মনে থাকে না। আফসানার বান্ধবী, আজ ওর জন্মদিন।
– তাই বলে এতবড়ো মেয়েকে এতো রাতে বাইরে থাকতে অ্যালাউ করেছ? কোনোদিনই কী তোমার কোনো বুদ্ধি হবে না? চিৎকার করতে করতে বশির সাহেব এবার প্রচণ্ড রাগে তাঁর হাতের ব্রিফকেস ছুড়ে মারলেন ঘরের কোণে। এতে ব্রিফকেসের ঢাকনা খুলে গিয়ে ভিতরের কাগজপত্র সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। সবাইকে নিয়ে বাইরে রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়া এই পরিবারের জন্য একটা বিরল ঘটনা। আজ মনটা বিশেষ ভালো থাকায় সবাইকে অবাক করে দেবার জন্য বশির সাহেব ফোন টোন না করেই বাসায় এসেছিলেন বাইরে ডিনারে যাবেন বলে। আফসানাকে ছাড়া সেটা কখনো সম্ভব নয়। মেয়েটা বড়ো হয়েছে। স্ত্রীর আক্কেল দেখে তিনি অবাক। সব মিলে প্রবল হতাশা প্রচণ্ড রাগের জন্ম দিলো তাঁর ভিতরে। বশির সাহেব গজ গজ করতে করতে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকে দরাম করে দরজা বন্ধ করলেন। এদিকে বেচারি ফরিদা বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে কতক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেন, তারপর একসময় আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ব্রিফকেসের কাগজপত্র কুড়িয়ে নিয়ে ভরতে লাগলেন। এতক্ষণে রাকিব চিৎকার শুনে পড়া ছেড়ে তার রুম থেকে বেরিয়ে এসেছে।
– কী হয়েছে মা? চেঁচামেচি শুনলাম, কী হয়েছে আব্বার? রাকিবের চোখেমুখে বিস্ময় ও কৌতূহলের একটা মিশ্রণ। সে মা'র হাত থেকে ব্রিফকেসটা নিয়ে টেবিলের উপর রাখল। ফরিদার ঘোর তখনো কাটেনি। তিনি বললেন –
– কী হয়েছে জানি না। তোর বাবা সবাইকে নিয়ে বাইরে খেতে যেতে চাইছে হঠাৎ করে এই রাতে। আফসানা বাসায় নেই শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। সেই আবার আগের মতো। মাত্র দু'মাসও হয়নি ...। ফরিদার গলা ধরে আসে।

এ বাড়িতে সব যেন আবার আগের মতো হয়ে গেল। পরের দিন সকালেও বশির সাহেবের হাবভাবে মনে হলো না যে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে আগের রাতে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন এবং তার জন্য তিনি দুঃখিত বা অনুতপ্ত। বরং আফসানাকে ডেকে ফরমান জারি করে দিলেন যে সে যেন কখনো তাঁর অনুমতি ছাড়া সন্ধ্যার পরে বাইরে না থাকে। আফসানা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে সে এখন বড়ো হয়েছে, তাছাড়া তার বন্ধুরাওতো তার জন্মদিনে এ বাড়িতে এসে রাত্র করে থাকে, ইত্যাদি। লাভ হয়নি কোনো, শেষ পর্যন্ত ধমক খেয়ে চুপ হয়ে যেতে হয়েছে তাকেও।
বশির সাহেব অফিসে যাবার পরে তিনজন কতক্ষণ চুপচাপ বসে রইল এক জায়গায়। ছেলেমেয়ে দুটোই আজ আর ইস্কুল কলেজে যাবে না।
দুপুরের দিকে ছুটা বুয়া রাবেয়ার মা মেঝে ঝাড়- দিতে গিয়ে খাটের তলা থেকে কিছু আলগা কাগজ ও একটা ফাইল বের করে ফরিদার হতে দিলো।
– খালাম্মা, খাটের তলায় পইড়া আছিল।
ফাইলটার দিকে তাকিয়ে ফরিদার ভ্রু কুঁচকে গেল। তিনি রাকিবকে ডাকলেন। বললেন – দ্যাখতো ফাইলটা, কাল নিশ্চয়ই তোর বাবার ব্রিফকেস থেকে পড়ে গিয়েছিল। ডাক্তারের ফাইল মনে হচ্ছে। তোর বাবা ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল কেন?
রাকিব বেশ সময় নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ফাইলের কাগজ-পত্র। ফরিদা দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে

লক্ষ করছেন ছেলেকে। রাকিবের কপালের ভাঁজ আর ক্ষণে ক্ষণে চেহারার পরিবর্তন দেখে তিনি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, কোনো খারাপ খবর?

হ্যাঁ, মা, খুবই খারাপ খবর – ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। আব্বার গলায় ক্যান্সার সন্দেহ করেছিল ডাক্তার। গত দেড় মাস নানান পরীক্ষা করেছে। গতকালের রিপোর্টে সব নেগেটিভ এসেছে। তাই বোধহয় আব্বা সবাইকে নিয়ে বাইরে খেতে চেয়েছিলেন।

থরথর করে কাঁপতে লাগলেন ফরিদা। দু'গাল ভাসিয়ে অশ্রু নেমে এলো চোখ থেকে। গত দেড়-দু'মাসের সুখস্মৃতি মনের পাতায় ছায়াছবির মতো প্রদর্শিত হতে থাকল তার। একসময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি যেন সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন– ক্যান্সারের চেয়ে বদমেজাজ অনেক ভালো, অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

‘ব্যাবিলন কথকতা’ এর ১৪তম সংখ্যা প্রকাশ– প্রত্যাশা, প্রতীক্ষা ও প্রাপ্তি

সাইদুর রহমান
সিনিয়র অফিসার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন প্রিন্টার্স লিমিটেড

১০ এপ্রিল ২০১৯, আমি ব্যাবিলন পরিবারের একজন নতুন সদস্য হিসেবে ব্যাবিলন প্রিন্টার্স লিঃ এ যোগদান করি। তারপর থেকে যত দিন যাচ্ছে ততই এই সফেদ পরিবারের রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও কৃষ্টির সাথে পরিচিত হয়ে চলছি। এরই ধারাবাহিকতায় একদিন জানতে পারলাম যে, এই পরিবারের পক্ষ হতে প্রতি বছর “ব্যাবিলন কথকতা” নামে একটি প্রকাশনা বের করা হয়। বিষয়টি আমাকে একটু নাড়া দিলো এবং উৎসাহিত ও আনন্দিত করল যে, কর্মব্যস্ততার মঝেও এখানে সাহিত্যচর্চা বা নিজের লেখনী প্রতিভা প্রকাশের একটা সুবিধা আছে। সেইসাথে আরও একটু বেশি উৎসাহী হলাম যে, পদাধিকার বলে আমার কিছু দায়িত্বও রয়েছে। লেখা আহবানের প্রচারণা কাজ থেকে শুরু করে লেখা সংগ্রহ ও তা প্রকাশনা কমিটির নিকট পৌঁছে দেয়া পর্যন্ত। সব মিলিয়ে বিষয়টি যেমন উৎসাহের সঞ্চার করলো ঠিক উল্টো দিকে ভীতিরও আনাগোনা শুরু হতে লাগলো। একেতো নতুন কর্মস্থানে টিকে থাকার ও নিজেকে এখানকার পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেবার একটা চ্যালেঞ্জ অপরদিকে বিশেষ দায়িত্ব “ব্যাবিলন কথকতা” এর প্রচারণা, লেখা সংগ্রহ ও প্রকাশনা কমিটির নিকট পৌঁছে দেয়া (যদিও কাজটির সিংহভাগই করেছেন ওয়েলফেয়ার অফিসার নিশাত ম্যাডাম)।

‘ব্যাবিলন কথকতা’ এর প্রচারণা ও লেখা আহবান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শ্রদ্ধেয় মাহমুদ স্যার, রুমানা ম্যাডাম ও আরিফ স্যার একাধিকবার আমাদের বিপিএল ফ্যাক্টরিতে আসেন এবং কারখানার লেখা আহবান কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং আরও অধিকতর কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। যা আমাকে অনেক বেশি আগ্রহী ও উৎফুল্ল করে তোলে এবং তাদের আলোচনা আমার অনেক জড়তাকে কেটে দেয়। এভাবে এক পর্যায়ে আমাদের কাছে কয়েকটি লেখা জমা হয় এবং আমিও আমার লেখা “মনের সিডর কেউ দেখে না” শিরোনামের লেখাটি জমা দিই। লেখা যাচাই, বাছাই ও নির্বাচনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের কাজ করছিলেন। এমন সময়ে আরিফ স্যার একদিন ফোন দিয়ে আমার লেখাটির সফট কপি চান। বিষয়টি আমাকে অধিকতর উৎফুল্ল করে তোলে এবং আমার সকল কাজের গতি হঠাৎ বেড়ে যায়। এই একটি মুঠোফোন বার্তা যেন আমার মাঝে টনিক হিসাবে কাজ করতে থাকে।

মনে অধিকতর আকাঙ্খা নিয়ে দিন গুনতে থাকি কবে 'ব্যাবিলন কথকতা' এর ১৪তম সংখ্যা প্রকাশ করা হবে। সহকর্মীদের জিজ্ঞাসা করতে থাকি (যারা কয়েক বছর হলো ব্যাবিলনে আছেন) কিভাবে 'ব্যাবিলন কথকতা' প্রকাশ করা হয়? কোথায় এর অনুষ্ঠান হয়? কে কে (ব্যাবিলন কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা ও অতিথিবর্গ) এর প্রকাশকালে উপস্থিত থাকে? আবার নিজেই ভাবতে থাকি এটা কি বেশি ছেলেমানুষি হচ্ছে কি না? জানতে পারলাম, প্রকাশনা অনুষ্ঠানে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে যে সকল সম্মানিত লেখকগণের লেখা প্রকাশ করা হবে তাদেরও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয়। এ যেন আমার মাঝে এক অসাধারণ চৌম্বকত্ব তৈরি করে। দিন যত ঘনিয়ে আসে আমার প্রতীক্ষার আকর্ষণ শক্তি ততই বাড়তে থাকে। একদিন দেখলাম মেইলে রুমানা ম্যাডাম আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ব্যাবিলন পরিবারের পদস্থ কর্মকর্তাগণকে। এরই মধ্যে জানতে পারি নির্বাচিত লেখার লেখকগণকে চিঠির মাধ্যমে আমন্ত্রণ করা হয়। আমি নিয়মিত গেইটে খোঁজ খবর নিতে থাকি কর্পোরেট অফিস হতে কোন চিঠি এসেছে কি না। প্রতিদিনের ফলাফল একই এবং ১৪ই ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ফলাফল অপরিবর্তিত। তারপর যা হবার তাই হলো, বুক ভরা প্রত্যাশায় গুড়ে বালি। উল্লেখ্য যে, ডিসেম্বর ২০১৯ এর প্রথম পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনে আমার গ্রামের বাড়ি যাওয়ার অনেক প্রয়োজন ছিলো। শুধুমাত্র একটা বিশেষ আকর্ষণ থাকায় ব্যক্তিগত এই প্রয়োজনকেও সুযোগ ব্যয় হিসাবে নিয়েছিলাম।

যথাযথ আনুষ্ঠানিকতা ও মহা সমারোহে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ "ব্যাবিলন কথকতা" এর ১৪ তম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অর্জিত হতাশা থেকে একটা ঈর্ষা'র সূত্রপাত হয়, মনে মনে স্থির করি প্রকাশিত সংখ্যাটির সবকটি লেখা পড়ে দেখবো যে, লেখার কোন ধরণের শিল্পগুণ বিচারে আমার লেখাটি প্রকাশের অযোগ্য হিসেবে নির্বাচিত হয়। যথারীতি প্রকাশের পরপরই আমাদের ইউনিটের জন্য বরাদ্দকৃত বই হাতে এসে পৌঁছাল। আবারও পদাধিকার বলে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করলাম। খুব ভালো লাগলো এর প্রচ্ছদ ছবি ও মোড়কের ডিজাইন দেখে। কিন্তু ক্ষণেই সেই অপ্রাপ্তিটা মনের কোনায় এটে বসলো, কি আছে এতে?

ছাত্র জীবনের পত্রিকা পড়ার কায়দায় শুরু করলাম পাঠ। লেখকের নাম দেখে যাদের সম্পর্কে চেনাজানা আছে আগে তাদের লেখা পড়তে থাকি। তারপর যে শিরোনামগুলো মনে ধরে সেগুলো, এভাবে পড়তে থাকায় নিজের অজান্তে ষোড়শী মেয়েদের প্রেমে পড়ার গল্পের মতো আমিও লেখাগুলোর প্রতি আসক্ত হতে থাকি। এক সময় লেখার তুলনামূলক শিল্পগুণ বিচারের কথা ভুলে গিয়ে তার ভেতরে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। এর ধারাবাহিকতায় একসময় এমন অভ্যাস গড়ে ওঠে যে, বই না পড়লে চোখে ঘুম আসে না। আসক্তি ও ভালো লাগার এই বিষয়টি আরিফ স্যারকে জানাই ও চমৎকার শিল্পগুণে ভরপুর এই লেখাগুলো প্রকাশের জন্য নির্বাচিত করায় তাঁর মাধ্যমে 'লেখা নির্বাচন কমিটি' ও "ব্যাবিলন কথকতা" কে ধন্যবাদ জানাই। পঠিত বইটির সম্মানিত লেখকগণের লেখার হাত এতটা পরিপূর্ণ ও সিদ্ধহস্ত যে, আঘাতের উদ্দেশ্যে যেয়েও ভালোবাসি বলে অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য হলাম। আমি কোনো

সাহিত্য সমালোচক বা রচনার শিল্পগুণ বিচারক নই কিংবা নিয়মিত পড়ুয়া পাঠকও নই, যে কোনো লেখার সমালোচনা বা গুণাগুণ বিশ্লেষণ করবো। কিন্তু ব্যাবিলন কথকতা'র ১৪ তম সংখ্যা পড়ে নিজের ভালোলাগা ও অভিজ্ঞতার কিছু বিষয় তুলে না ধরলে নিজের কাছে নিজেকেই খুব কৃপণ লাগছে, তাই আমার একান্ত ব্যক্তিগত কয়েকটি কথা বলছি–

'বটগাছ' লেখাটি পড়ে এর অন্তর বার্তা আমি যতটুকু উপলব্ধি করেছি তা লিখতে গেলে আমার শব্দ ভান্ডারে আগে আরও বেশকিছু গুণবাচক শব্দ জমা করতে হবে। নিজের অপূর্ণতা বিচার করে স্বল্প চরণের এই লেখাটিকে জানার ও উপমার বিষয়বস্তু নির্ধারণে যথার্থ মনে হয়। কামিনী ও কৃষ্ণচূড়া শিরোনাম দেখে ভেবেছিলাম লেখিকা তার ফুলপ্রীতিকে সাদা কাগজে কালো কালি দিয়ে রঙিনভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আদ্যোপান্তে ফুল দু'টির নামই পেলাম মাত্র; অথচ এর গহীনে রয়েছে এক প্রকৃত প্রেমের অসমাপ্ত পরিণতীর কাহীনি ও পরস্পরের প্রতি অঘাত প্রেমের ছোটগল্প। একজন সিদ্ধহস্ত লেখকের পক্ষেই কেবল এমন সামান্য বিষয়ের অসামান্য উপস্থাপন সম্ভব।

ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে বর্তমান কর্মজীবনে বহু প্রতিযোগিতামূলক ও বৃত্তিমূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু স্মৃতির পাতা ব্যতীত অন্য কোথাও এর উপস্থাপন বা সংরক্ষণ সম্ভবপর হয়নি। "রুদ্ধশ্বাস পঞ্চাশ মিনিট" লেখাটি পড়তে গিয়ে নিজেকে এতটা হারিয়ে ফেলেছিলাম যে, আমার কাছে মনে হয়েছে আমি নিজেই বুঝি সমস্যাটির মধ্যে আটকা পরে আছি। যে কারণে গল্পটি পড়া শেষ না করে আমি মূত্র বিসর্জন পর্যন্ত দিতে পারিনি, মনে হয়েছিলো ওকাজে গেলে সময় নষ্ট হবে। কতটা পরিপূর্ণতা ও শিল্পগুণে ভরা লেখা হলে তার মাঝে পাঠক হারিয়ে যায় তা শুধু একজন বিজ্ঞ সাহিত্য সমালোচক বা বিশ্লেষকের পক্ষেই বলা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডারে 'মায়া' শব্দটি ব্যাকরণের রীতিতে বিশেষণ পদ। যা দ্বারা মানুষের একটি বিশেষ গুণ প্রকাশ পায় আবার অনেকে গুনবাচক এই শব্দটিকে মানুষের নাম হিসাবেও নির্ধারণ করে থাকে। "ব্যাবিলন কথকতা" এর ১৪ তম সংখ্যায় 'মায়া' শিরোনামে যে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে সেখানে মায়া একটি মেয়ের নাম, যে কি না ইহলোক ত্যাগ করেছে বহু আগেই। কিন্তু লেখক তার লেখনীর মাধ্যমে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, পাঠক হয়েও মেয়েটির বাবার বর্ণনায় আমার কাছে মনে হয়েছে গল্পের অন্যতম চরিত্র শফিকের মতো কল্পলোকে আমিও জানালার ওপাশে মায়ার মায়াবি মুখচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি।

লেখকগণ তাদের কলমের ছোঁয়ায় সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনা, শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন ও নানাবিধ বৈচিত্র তুলে ধরেন। আধুনিক সভ্যসমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আশির্বাদে মানুষ যেমন আধুনিকতার স্পর্শে উন্নত থেকে উন্নততর জীবনযাপন করছে তেমনি এর বিপরীতে হারিয়ে ফেলছে হাজার বছরের বহু লালিত সংস্কৃতি। এঁটে বসেছে ধার করা

মুখোশ সংস্কৃতি, বস্তুত যা অপসংস্কৃতি আর বিতাড়িত হচ্ছে মুখশ্রীগুলো। 'বৈধ পরকীয়া' শিরোনাম দেখে মনে মনে ভাবছিলাম যে, হয়তো কোনো মুখরোচক ঘটনার লিখিত সংস্করণ হবে। ভেতরে ভেতরে পুলকিত ভাব নিয়ে পড়া শুরু করলাম। বিষয়টি পড়ার পর আমার ক্ষুদ্র মেধা যা উপলব্ধি করলো, তা হলোঃ তথাকথিত আধুনিক পরিবারের সদস্যগুলোর প্রযুক্তির অপব্যবহার ও তা থেকে উদিত বিকৃত চাহিদার অপ্রাপ্তি মোচনে গৃহীত অবলম্বন কতটুকু পরিতৃপ্তি দিতে পারে তা যদিও সুস্পষ্ট নয়; কিন্তু কবির লেখা নিচের চরণগুলো প্রমাণিত হয়।

বহু দেশ ঘুরে, বহু ব্যয় করে,
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া,
একটি ধানের শীষের উপর, একটি শিশির বিন্দু।

মীর মোশাররফ হোসেনের "অপূর্ব ক্ষমা", রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের "ছুটি" শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বিলাসী" রচনাসমূহ পাঠকের মনের গভীরে স্থান দখল করে আছে। উল্লেখিত রচনাবলীর ন্যায় "ব্যাবিলন কথকতা" এর ১৪ তম সংখ্যার 'কৈ মাছের ঝোল' লেখাটি আমার হৃদমহলে স্থান দখল করে নিয়েছে। কর্মব্যস্ত জীবনে একজন সাধারণ শ্রমিক এমন অসাধারণ লেখা লেখতে পারে যা আমার কাছে কবি নজরুল ইসলামের সংগ্রামী জীবনের প্রতিচ্ছবি বলে মনে হচ্ছে।

আলোচনা বা সমালোচনা একদিকে যেমন কোন একটি বিষয় বা বস্তুর নেতিবাচক দিক প্রকাশ করে অন্যদিকে তার সৌন্দর্য ও প্রচারণা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে এবং এর মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করা যায়। একটি তীর্যক উদ্দেশ্য নিয়ে আমি পত্রিকাটি পাঠ শুরু করলেও সম্মানিত লেখকগণের শিল্পগুণে ভরা লেখা গুলো আমাকে এর একজন পাঠক বানিয়ে নিয়েছে। যার সম্পূর্ণ সফলতা আমি মাননীয় সম্পাদক মহোদয় ও লেখা নির্বাচকগণকে দেব। আমার এই লেখাটি "ব্যাবিলন কথকতা" এর সাথে জড়িত সকলের জন্য একটি খোলা চিঠি মাত্র।
ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা "ব্যাবিলন কথকতা"
তুমি চিরজীবী হও, তোমার সকল শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে।

যাযাবরের অনুভাবনা

মাহমুদ আলম সিদ্দিকি
প্রাক্তন সিনিয়র ম্যানেজার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

অনুভাবনা-১

প্রেমবাজারের কাঠবাদাম গাছের নিচের এই চায়ের দোকানটার সাথে কখন যে বড় বেশি প্রেম হয়ে গেছে রতনের! বছর দশেক তো হবেই। দিনের শেষভাগের সময়টা দোকানের কালচে হয়ে যাওয়া বেঞ্চিটাতে হেলান দিয়ে বাজারের পরিচিত জগৎটা সে নতুন করে দ্যাখে খোদার তিরিশ দিন। আজও ব্যতিক্রম হয়নি।

রাস্তার উল্টোদিকে একটা ছোট্ট টঙঘরে বেশকিছু ডোরাকাটা তরমুজ নিয়ে ভালোই বিক্রি করছে ফজর কাকা। রতন নিবিষ্ট হয়ে তরমুজের বেচা-বিক্রি দেখে। ক্রমেই ভীড় বাড়ছে তরমুজের দোকানে। ফজর আলি বাম হাতে তরমুজ তুলে ডান হাতে একটা কিংবা দুইটা থাপ্পড় মারে। তারপর একটা আহ্লাদের হাসি দিয়ে ক্রেতার হাতে তরমুজ তুলে দেয়। টাকা গুনে পকেটে রাখে।

সন্ধ্যার আগেই প্রায় সবগুলো তরমুজ বিক্রি হয়ে যায়। রতন খেয়াল করে, শেষ তরমুজটাতেও একটা যুৎসই থাপ্পড় মারে ফজর কাকা। চোখেমুখে সেই পরিচিত হাসি। ক্রেতার চোখেও তার সংক্রমণ ঘটে। রতনের চোখেও...

অনুভাবনা-২

আমার এক আত্মীয়ের কথা প্রায়ই মনে পড়ে। মনে পড়লে আমি নিঃশর্তে ক্ষমা চেয়ে নিই প্রতিবার। বেচারা বুড়ো বয়সের চার সন্তানের সংসারের ঘানি টানতে নিরন্তর শ্রম দিতেন ভোর থেকে রাত পর্যন্ত। টানাপোড়েন তবুও ঘোঁচেনি। পরিবারের আরেকটু সংস্থানের জন্য মক্তবেও পড়াতেন সকাল-সন্ধ্যা। আমাদের সেই শৈশবে অথবা কৈশোরে খুব বেশি মিলাদের

প্রচলন ছিলো। তবারক হিসেবে জিলাপী, দানাদার, বাতাসা অথবা ক্ষীরের প্রভাব ছিলো তখন। আমার সেই আত্মীয়কে দেখতাম- তবারকগুলো কাগজে মুড়িয়ে পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকাতেন। সন্তানদের জন্য নিয়ে আসতেন। বিষয়টা নিয়ে সেই নাবালককালে হাসাহাসি করেছি, তাঁর দীনতাকে (?) তাচ্ছিল্য করেছি কত!

আমি যে অফিসে চাকরি করি, ব্যাবসায়িক প্রয়োজনে প্রায়ই আমার কলিগগণ দেশের বাইরে যান, আর ফেরার পথে যথারীতি বিদেশি চকলেট নিয়ে আসেন। অফিসের অলিখিত সংস্কৃতি হয়ে গেছে বিষয়টা। আমরা সবাই এর ভাগ পাই। বয়স বাড়লেও চকলেট এখনো আমার বেশ প্রিয়, আর যদি হয় বাইরের! অথচ অলক্ষ্যে আমি চকলেটগুলো আমার অফিস ব্যাগের পকেটে সযত্নে ঢুকিয়ে দিই। বাসায় আমারও যে চকলেট-প্রিয় দুটি সন্তান আছে। বহু আগে পরলোকগত সেই আত্মীয়ের পাঞ্জাবির পকেট আর আমার ব্যাগের পকেট সময়কাল স্বচ্ছলতা, অস্বচ্ছলতার সকল ব্যবধান ডিঙিয়ে কখন যে এক হয়ে যায় বুঝতে পারি না- যদিও আমার যথেষ্ট সামর্থ আছে, যদিও আমি প্রতিদিনই ওদের জন্য ভালো ব্রান্ডের চকলেট নিয়ে বাসায় ফিরি।

ক্ষমা করো হে পরলোকগত আত্মীয় আমার, কেননা আমিও তোমার মতো বাবা হয়েছি আজ।

অনুভাবনা-৩

ঝুম বৃষ্টি নামছে। চরাচর রূপালি জলের রোমান্টিক কাব্যে বিভোর। প্রায় দুঘণ্টা হলো- এক অদ্ভূত খোয়ারিতে আচ্ছন্ন রতন। ফজর কাকার দোকানের সামনের দিকের বেঞ্চিতে বসে অপলক চেয়ে আছে রাস্তার দিকে। কালো পিচের উপর তীরের ফলার মতো বৃষ্টির ফোঁটাগুলো আছড়ে পড়ে কীরকম মুক্তোর মতো ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে!

দোকানের ভেতর থেকে ঝাঁঝালো ঝগড়ার আওয়াজ আসছে। একটা নারীকণ্ঠের বাজখাই উত্তেজনা টিনের চালে বৃষ্টির ধুন্ধুমার অর্কেস্ট্রাকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে, কিন্তু কথাগুলো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামছে যে!

আরো কিছুক্ষণ পর বৃষ্টির তেজ কিছুটা কমে আসে। ভেতরের ঝগড়ার শব্দ এখন স্পস্ট শুনতে পায় রতন।

-এ গুলামের ছাওয়াল গুলাম, তাই বইল্যা তুই আমার রিলিপির চাইল কম দিবি! ১০ কেজিতি তিন কেজি চুরি হরবি! তোর কী আল্লাহ খুদা নাই? এই জুন্নি কি তোরে ভোট

দিছিলাম, এ শুয়্যার ভাতারির ছাওয়াল!

-আর কোনো কথা কবা না খালা। গালি দিবা না আর এট্টাও কয়লাম। যা পাইছো তাই নিয়্যা বাড়ি যাও। সরকার আমারে যা দিছে, তোমারে আমি তা ই দিছি। তুমাগো কোনো শোকর নাই। আর ভোটের খুটা দিবা না কইয়্যা দিলাম। ভোট কি এমনি দিছিলা নি? তুমার এট্টা ভোটের জুন্নি তিন আজার টাহা নিছো, মনে নাই?

প্রেম বাজারের মাথার উপর আবার ঝুম বৃষ্টি শুরু হয়। রতন আর কিছুই শুনতে পায় না এখন। টিনের চালে মেঘের অর্কেস্ট্রার শব্দে চাপা পড়ে জমিলা খালা, আব্বাস মেম্বারের গলার উত্তেজনা।

অনুভাবনা-৪

বাড়ির মেয়েমানুষদের দৌড়ানি খেয়ে গমক্ষেতের আলপথ, ধনেপাতার ঢেলা জমিন আর কাদাপানির জলা পেরিয়ে কোনোরকমে হাটের মানুষের গিজগিজ করা ভীড়ের ভেতরে নিজেকে সেঁধিয়ে দিয়ে টুপ করে হাটের দক্ষিণ দিকের সনু মোল্লার চায়ের দোকানের পেছনে গিয়ে আশ্রয় নেয় দুদু মিয়া। এই পৌষালি শীতের কনকনে বিকেলে দরদর করে ঘাম দেয় তার চকচকা শরীরে, চিকচিক করে চওড়া কপালেও। সে কি দৌড়! সেরেঙ্গেটি ন্যাশনাল পার্কে চিতার তাড়া খেয়ে হরিণ যেমন দৌড়ায়! আহা, এই ছিলো তার কপালে! এখন সে পালাবেই বা কোথায় আর মুখ দেখাবেই বা কী করে। গ্রামের তাবৎ মানুষ তাকে কত মান্য করে। ইহকাল পরকাল নিয়ে সে যখন বয়ান করে তখন কীরকম মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায় মানুষগুলো! গিলে গিলে শুনে দোজাহানের অশেষ নেকি হাছিল করে গদগদ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়- দুদু মিয়া ভাবে আর মনে মনে কপাল চাপড়ায়।

সনু মোল্লার চায়ের দোকানের পাশেই যে বিরাট বটগাছটা তার নিচে হঠাৎ জটলা লেগেছে হাটুরেদের। টিভি চ্যানেলের ক্যামেরা, মাইক্রোফোনওয়ালা জনাতিনেক তরুণ নানারকম কায়দাকেতা করে অন্য প্রান্তের স্টুডিয়োর সাথে সংযুক্ত হয়ে কী যেন জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে এবং তারপর একজন মধ্যবয়সী হাটুরের দিকে এগিয়ে যায়।
-আচ্ছা এই যে ভাস্কর্য আর মূর্তি, এ দুটোর পার্থক্য কী? আপনি কী জানেন এ ব্যাপারে?

-অতো বুঝি না, তয় দুইডারে তো একইরকম লাগে। মনে হয় একই-উত্তর দেন লোকটি।

-আপনি কি মনে করেন ভাস্কর্য কিংবা মূর্তি আমাদের জন্য ক্ষতিকর! আরেকজন বৃদ্ধের দিকে মাইক্রোফোন এবার।

-হ, ক্ষতিই তো, ইসলামে মানা আছে। ওগুলান না বানানোই উচিৎ-বৃদ্ধ বলেন।

তুমি কী মনে করো ছোট ভাই- একজন কিশোরকে জিজ্ঞেস করে তরুণ সাংবাদিক।
-আমাগো ক্ষ্যাতে আমরা মূর্তি টাঙাইছি, পাঁচখান মূর্তি, নাইলে পাখিতে ক্ষ্যাত খায়। ওইযে দ্যাহেন- অদূরের একটা টমেটো ক্ষেতের মাঝখানে দুইহাত প্রসারিত কাকতাড়ুয়ার মূর্তিটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখায় সে। অবাক সাংবাদিক পিচ্চির চোখের দিকে তাকায়। কী সারল্য তার চোখে-মুখে। তার হাতের মাটির ঘোড়াটি কী সুন্দর!

সাংবাদিক তার মাইক্রোফোন নিয়ে এগিয়ে যায় গুটিসুটি হয়ে বসে থাকা দুদু মিয়ার দিকে। দুদু মিয়া আরো খানিকটা গুটিসুটি হয়।

সাংবাদিক জিজ্ঞেস করে- এই যে ভাস্কর্য, মূর্তি এগুলো নিয়ে আপনার কী অভিমত, আপনি কী মনে করেন এগুলোকে? এগুলো ভালো না মন্দ?

-নাউজুবিল্লাহ, এগুলো বেদাত, বেশরিয়তি, নাফরমানদের কাজ এগুলা...

হাটের উত্তর দিক থেকে নারীকণ্ঠের শোরগোল আসে। ক্রমশ জোরালো হয় শব্দ। একদল মেয়েলোক লাঠি আর ঝাড়ু হাতে হৈ হৈ করে কাকে যেন খোঁজে। তাদের চোখেমুখে আগুন। তাদের পায়ে ধাবমান ঘোড়ার গতি। তাদের চেহারায় কুমিল্লার তনু, সোনাগাজির নুসরাত, সুবর্ণচরের নির্যাতিত মেয়েদের প্রতিমূর্তি...

সাংবাদিকের মাইক্রোফোন হাতে নিয়েই দৌড়াতে শুরু করে দুদু মিয়া। পুকুরের পাড় ধরে মাঠের দিকে প্রাণপন দৌড়াতে থাকে সে। অবাক সাংবাদিক আর হাটের মানুষগুলো কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। নারী কণ্ঠ আরো জোরালো হয়। জমায়েতের মধ্য থেকে কে যেন ভয়াল চিৎকার করে বলে ওঠে- তোরা ধর ওরে। অবুঝ মাইয়াডারে ওই পাষণ্ড... ধর তোরা...

করোনার আঘাতে জাগ্রত চেতনা

মুহাম্মদ সাইফুল হক
প্রাক্তন এজিএম, মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

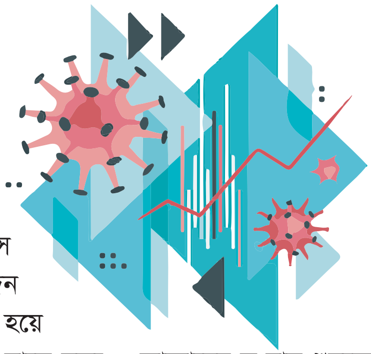

আজ সারা বাংলাদেশে মারা গিয়েছে ৪৪ জন,
আক্রান্ত হয়েছে ৩১২২ জন,
শনাক্ত বিবেচনায় মোট আক্রান্ত শতকরা ২২ ভাগ।
সারা বিশ্বে মোট মৃত্যু ৬১৫৩ জন।
নতুন শনাক্ত হয়েছে ১ লক্ষ ২২ হাজার ৩১২ জন।
প্রতিদিনকার সংবাদ ব্রিফিং এর উল্লেখ করেছিলাম মাত্র। সারাবিশ্বকে কাঁপিয়ে দেয়া সেই অদৃশ্য ভাইরাস নিয়ে অন্তত গত ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে প্রতিদিন এই সংবাদ শুনতে শুনতে একঘেয়ে লাগলেও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। প্রথম দিকে খুব ভয় পেতাম কিন্তু গত ছয় মাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংবাদ শুনতে শুনতে ভয় কেটে গিয়েছে। সরকারী ঘোষণায় ভেবেছিলাম অল্প কিছু দিন ঘরে থাকলেই বোধহয় আমরা করোনা সংক্রমনের হাত থেকে মুক্ত থাকতে পারব। কিন্তু বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। রোজা এবং পরপর বাৎসরিক দুটো ইদ কেটে গেলো কিন্তু অদৃশ্য করোনা থেকে মুক্ত হতে পারিনি এখনও। জীবিকার টানে ঘরে বসে থাকাও আর কারো পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাই এক নতুন জীবনের মুখোমুখি। এই জীবনে জীবিকা ও মৃত্যু খুব ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি রয়েছে। আর তাই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি মৃত্যু বা বিপর্যয় একেবারে কাছাকাছি। জীবিকার চাহিদা মৃত্যু ভয়কে জয় করেছে আর তাই এখনও এগিয়ে চলেছি। মৃত্যুর খুব কাছাকাছি থাকায় প্রতিদিন প্রতিক্ষণকে গুরুত্ব দেয়ার বা সৃষ্টিকর্তাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর উপলক্ষ্য তৈরী হয়েছে। নিজে আল্লাহর বিশেষ রহমতে সুস্থ থাকলেও আপনজনের অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন আছি আজ বহুদিন। জোরে হাসলে শরীর হালকা হয়ে আসে কিন্তু নানা উদ্বেগে অনেকদিন জোরে হাসতেও পারি না। আপনজনদের প্রত্যাশা নিজস্ব সীমাবদ্ধতায় অপূর্ণ থাকে অনেকটাই। এরপরও টিকে আছি, "ব্যাবিলন কথকতা"র জন্য লিখছি সেটাই বড় কথা। "ব্যাবিলন কথকতা" তোমাকে খুব ভালোবাসি কেন না মনের জটিল অবস্থাটা কেবল তোমার মাধ্যমেই তুলে ধরার সুযোগ আছে। আজকাল তো কেউ কারো কথা শুনে না, শুনলেও তাকে মূল্য দেয় না। তবে তুমি যে মনের কথাগুলো ধারন করে রাখো সে জন্য তোমায় কৃতজ্ঞতা। করোনাকাল আমাদের সারা বিশ্ববাসীর জন্য কেবল মহামারীই নয় বরং নিজেকে উপলব্ধি ও আবিষ্কার করার এক চরম সুযোগ। আপনজনের অসুস্থতা, মানুষের মৃত্যু চিন্তা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় এসবই হয়তো আমরা কেবল মনে রাখছি। কিন্তু করোনা নিজেকে

চেনার বা জানার, সীমাবদ্ধতা ও অপারগতার যে উপলব্ধি দিয়েছে তাই বা কম কিসে। সেই উপলব্ধি নিয়ে যদি আমরা জীবনকে নতুনভাবে গড়ি, হতেও তো পারে মহামারীর কারণে আমরা বিশ্ববাসী যা হারালাম– সুখ, শান্তি, অর্থ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি তা আবার ফিরে আসতে পারে বহুগুনে। ব্যক্তিগত জীবনে আমি আশাবাদী লোক বলে হয়তো খুব সহজ ভাবছি, কিন্তু হতে পারে তা সহজ নয়। তবে কঠিনের চর্চা করার মধ্যেও তো একটা সংগ্রাম আছে, জীবন আছে। সংগ্রাম ছাড়া জীবন কি পানসে নয়! করোনাকালীন সময়ে তৃতীয় ভাষা দখলের চেষ্টা আমাকে কিছুটা একাকী করে তুলেছে। কিন্তু সেই জীবনেও আমি যাদেরকে পেয়েছি, তাদের প্রতি আমার অফুরন্ত ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা। করোনাকালীন জীবনে মুক্ত জীবনের মূল্য বুঝেছি। নাক মুখ ভরে বাতাস নেয়ার স্বস্তি বুঝেছি, চোখ-মুখ-দাঁত খুলে হাসির আনন্দের মূল্য বুঝেছি। রাস্তায়-হাঁটে, মাঠে-ঘাটে মুক্তভাবে হাঁটার মূল্য বুঝেছি। ছয় মাসের বেশি সময় ধরে প্রতিদিন অপেক্ষা করছি কখন শুনতে পাবো আজ থেকে আমরা করোনা মুক্ত। আর করোনাকালীন জীবনের সকল দুঃখ, জ্বালা যন্ত্রণাকে শক্তি বানিয়ে জীবনের নতুন উপলদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে এক নতুন পৃথিবী বিনির্মানে কাজ করবো। দুনিয়ার এই অনিশ্চিত জীবনকে কেবল উপভোগের জন্য যারা নিজের আকাঙ্খাকে নীতিহীনভাবে লালন করছে আশা করি তারা এবার থামবে। পৃথিবী তার হারানো গতি ফিরে পাবে। অর্জিত শিক্ষা উপলদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সকল অত্যাচার, অনাচারমুক্ত বিশ্ব নতুনভাবে জেগে উঠবে। পৃথিবী হয়ে উঠবে সমৃদ্ধশালী, সুখী ও সার্বজনীন। আমরা একটি সার্বজনীন জীবনাচরণের উদ্যোগ নেবো, সৃষ্টিকর্তার দেয়া সুস্থতা ও সময়ের যথাযথ ব্যবহার করবো। করোনা আমাদের একাকী করেছে, অর্থ কেড়েছে, অসহায় বানিয়েছে। এত সব খারাপ কিছুর মধ্যেও জাগিয়েছে আমাদের চেতনা। সেই চেতনার বলে বলিয়ান হয়ে যদি আমরা জীবনের অর্থ নতুনভাবে গড়তে পারি তাতেও কিছুটা ক্ষতিপূরণ হবে। কিন্তু তা না হলে এ কেবল অমোচনীয় ক্ষরণেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে যা কোনো মানুষের কাম্য নয়।

রোদেলা স্বপ্ন

মাহমুদ হোসাইন
ডেপুটি ম্যানেজার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় রোদেলার। ঘড়িতে সময় রাত ৩:৫০। মধ্যরাতের শেষাংশ। শীতের রাত, সকাল হবার এখনো অনেক দেরি। ইদানিং প্রায়ই মাঝরাতে রোদেলার ঘুম ভেঙে যায় দুঃস্বপ্ন দেখে। যদিও মাঝে মাঝে কিছু সুন্দর স্বপ্নও দেখে। যেদিন খুব বাজে স্বপ্ন দেখে সেদিন যেন ভয়ে শরীরের সবগুলো লোম দাঁড়িয়ে যায়। গলা শুকিয়ে আসে। হাতের কাছে পানি ভর্তি বোতল থাকলেও তা পান করতে পারে না। মনে হয় কেউ যেন পুরো শরীরটাতে ভারী পাথরের বস্তা চাপা দিয়ে রেখেছে। অনেকক্ষণ লাগে স্বাভাবিক হতে। আবার যেদিন সুন্দর স্বপ্ন দেখে, সেদিনও তার ঘুম ভেঙে যায়। তখন তার মিষ্টি খেতে খুব ইচ্ছে করে। যদিও রোদেলার মিষ্টি একদমই পছন্দ না। ছোটবেলায় দাদির কাছে শুনেছে, কেউ যদি কোনো খুশির সংবাদ দেয় বা খুশির কোনো ঘটনা ঘটে তবে মিষ্টিমুখ করতে হয়। এতে সৃষ্টিকর্তাও খুশি হন। যেহেতু ঘুমের ভিতরে সৃষ্টিকর্তা খুশির সংবাদ দেন, তাই সুন্দর স্বপ্ন দেখলে ঘুম থেকে উঠে রোদেলা নিজেই মিষ্টি খায়। এমনও হয়েছে বাসায় মিষ্টি না থাকলে রোদেলা দাদির উপদেশ অনুযায়ী চিনি খেয়েও মিষ্টিমুখ করেছে অনেকবার। তবে আজ রাতের স্বপ্নটা একটু বেশিই অদ্ভুত! এমন স্বপ্ন রোদেলা আগে কখনো দেখেনি। ঘুম ভাঙার পর ক্রমাগত ঘেমে চলেছে সে। অথচ পাশে শাহেদ ঘুমিয়ে আছে কত শান্তিতে! অনেকটা নিস্পাপ লাগছে শাহেদকে। এক তীব্র অভিমানে, রোদেলা তার এই দুঃস্বপ্ন, অস্থিরতা শাহেদকে একটুও বুঝতে দিবে না।

রোদেলা তার স্বপ্নটি মনে করার চেষ্টা করছে। স্বপ্নে একটা ছোট্ট মেয়েকে দেখতে পেয়েছিলো। মেয়েটির চেহারাটা পুরোপুরি মনে করতে না পারলেও সারামুখে ছিলো তার দুষ্টুমি হাসিতে ভরা। বয়স হয়তোবা আনুমানিক ৩-৪ বছর হবে। পুরো বাসায় খুশিতে মেয়েটা দৌড়ে বেড়াচ্ছিলো। হাতে ছিলো ছোট্ট একটা পুতুল আর পায়ে নূপুর। নূপুরের ঝুনঝুন শব্দে পুরো বাড়িতে একটা চমৎকার ছন্দ তৈরি হয়েছিলো। শব্দটা রোদেলার খুব ভালো লেগেছে। মনে হচ্ছিলো, এত সুন্দর শব্দ সে আগে কখনও শোনেনি। মেয়েটা রোদেলার কাছে আসে না, কিন্তু দূর থেকে হাত নেড়ে রোদেলাকে কাছে ডাকে। রোদেলা যখন মেয়েটাকে ধরতে যায় তখনি মেয়েটা দূরে পালিয়ে যায়। এভাবে অনেকক্ষণ চেষ্টা

করেও মেয়েটাকে রোদেলা ধরতে পারে না। আর ভাবতে চায় না রোদেলা। মেয়েটাকে ধরতে না পারার জন্য হৃদয়ের গভীরে কোথায় যেন একটা তীব্র কষ্ট অনুভব করে রোদেলা। তাই আর ভাবতে চায় না সে।

হঠাৎ রোদেলার মনে পড়ে ১৩ নভেম্বরের কথা। যেদিন রোদেলার জীবনে ঘটে গেছে এক অনাকাঙ্খিত ভয়াবহ দুঃখের ঘটনা, যা কেবলমাত্র শাহেদ ছাড়া আর কেউ জানে না। তারা দুজন ভালোবেসে সংসার শুরু করেছিলো। দুই পরিবারের অমতে বিয়েটা হয়েছিলো। যদিও বিয়ের এক বছরের মধ্যেই দুই পরিবার থেকে ওদের বিয়েটাকে মেনে নেয়। অনেকটা সুখে, শান্তিতে আর ভালোবাসায় চলছিলো তাদের সংসার। ওদের বিয়েটা মেনে নেয়ার পর থেকেই শাহেদের বাবা-মা নাতি/নাতনির মুখ দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়। রোদেলাও তাদের সাজানো-গোছানো সুখের সংসারে একজন ছোট্ট অতিথির অভাবটাই যেন অনুভব করছিলো। শ্বশুর-শাশুড়ির এ ইচ্ছার সাথে একাত্ব হয়ে রোদেলা খুশিমনে শাহেদকে তার ইচ্ছার কথা জানায়। শাহেদকে চুপ থাকতে দেখে রোদেলা তার মনের কথা আবারো শাহেদকে জানায়। অনেকক্ষণ চুপ থেকে শাহেদ বলে, আরো কিছুদিন পর দেখা যাবে। তার এ জবাবে রোদেলা বেশ অবাক হয় এবং কিছুটা কষ্ট পেয়ে তার সাথে আর কথা বাড়ায় না।

এরপর এক বছর পার হয়। শাহেদ এখনো এ ব্যাপারটিতে এক প্রকার নিশ্চুপ থাকে। হঠাৎই রোদেলা কনসিভ করে। যদিও শুরুতে রোদেলা ব্যাপারটি বুঝতে পারেনি। যখন রোদেলা নিশ্চিত হয় এবং অনুভব করে– তার মধ্যে আর একটি প্রাণের অস্তিত্ব, তখন রোদেলা যেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ! সে মনে মনে ভাবে, শাহেদকে জানালে সে কতই না খুশি হবে! রোদেলা অপেক্ষায় থাকে– কখন শাহেদ বাসায় ফিরবে আর কখন তাকে জানাবে। কিন্তু আজ এখনো আসছে না কেন! অনেক রাত হয়েছে। অফিস শেষে শাহেদ কখনো দেরি করে না। আর যদি কখনো খুব প্রয়োজন হয় তবে আগে রোদেলাকে ফোন দিয়ে জানিয়ে দেয়, বাসায় ফিরতে এক ঘণ্টা দেরি হবে। ঠিক এক ঘণ্টার ভিতরে বাসায় ফিরে। কিন্তু আজ কী হলো? কোনো বিপদ হয়নি তো? শাহেদকে ফোনেও পাওয়া যাচ্ছে না। ভালো খবর দেবার অস্থিরতার সাথে সাথে এখন আবার দুশ্চিন্তাটা সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ কলিংবেলের শব্দ। দরজা খুলতেই রোদেলার উৎকণ্ঠা, এতক্ষণে ফিরলে, কোথায় ছিলে, ফোন দাওনি কেন? আমার বুঝি টেনশন হয় না?

– আমাকে কি একটু কথা বলার সুযোগ দিবে? নাকি তুমিই বলে যাবে? ফোনে চার্জ না থাকায় ফোন বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

– আচ্ছা তুমি ঝটপট ফ্রেশ হয়ে নাও, তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে।

– কী সারপ্রাইজ বলো তাড়াতাড়ি। শাহেদ আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে।

– না, এখন না। তুমি ফ্রেশ হয়ে আসো।

– বাসায় ঢুকতে না ঢুকতে এতগুলো কথা বলতে পারলে আর এখন কী সারপ্রাইজ তা বলতে পারবা না?

– না, বলবো না মিস্টার। দ্রুত ফ্রেশ হয়ে আসো।

শাহেদ ফ্রেশ হয়ে আসার পর খুব খুশিমনে তার সামনে দাঁড়ায় রোদেলা। চোখেমুখে যেন তার সাত রাজার ধন পাবার আনন্দ, হৃদয় যেন বাঁধভাঙা আনন্দে আজ উল্লসিত!

– রোদেলা তোমাকে আজ খুব খুশি খুশি লাগছে, ব্যাপার কী? জিজ্ঞেস করে শাহেদ।

– হ্যাঁ শাহেদ, আজ আমি খুব খুশি এবং আমার এ আনন্দ আমি তোমার সাথে শেয়ার করতে এসেছি। আমি জানি, তুমি ভীষণ খুশি হবে। আমি 'মা' হতে চলেছি শাহেদ, তোমার সন্তানের মা!

শাহেদ চুপ করে থাকে। রোদেলার মুখে তখনও খুশির হাসি। শাহেদকে চুপ থাকতে দেখে অবাক হয় রোদেলা।

– কী ব্যাপার! তুমি কি খুশি হওনি শাহেদ? জিজ্ঞেস করে রোদেলা। শাহেদ কোনো উত্তর দেয় না।

– তুমি যে কনসিভ করেছো, এ খবর আর কে কে জানে? কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর জিজ্ঞেস করে শাহেদ।

– আর কেউ জানে না, কারণ আমি চেয়েছি আমার জীবনের এই আনন্দের সংবাদটা সবার আগে তোমার সাথে শেয়ার করবো। তাই অন্য কাউকেই এখনো বলিনি।

– ভেরি গুড, তুমি অনেক বুদ্ধিমতি মেয়ে। এজন্য আমি তোমাকে এতটা পছন্দ করি। রোদেলা তুমি এই ব্যাপারটা আর কারো সাথে শেয়ার করবে না। আমাদের ইচ্ছেতে না হয়ে যা ভুলবশত হয়েছে, তা কারো সাথে শেয়ার করার দরকার নেই। তাছাড়া আমরা এখন এর জন্য প্রস্তুতও নই।

রোদেলা অবাক হয়ে শুনছিলো শাহেদের কথা। তার বিশ্বাসই হচ্ছিলো না শাহেদ এসব বলছে! এবার সে প্রতিবাদী হয়, চিৎকার দিয়ে বলে,

– দেখো শাহেদ, এতদিন একটি বেবির জন্য আমি তোমাকে অনেকবার বলেছিলাম। তুমি সব সময় চুপ থেকেছো, আমিও আর কিছু বলিনি। কিন্তু এখন তুমি যতই বলো না কেন ভুল হয়েছে কিংবা আমাদের ইচ্ছেতে হয়নি, আমি তা কিছুতেই মানবো না। আমি আমাদের সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখাবোই। সৃষ্টিকর্তার করুণা ও ভালোবাসা উপেক্ষা করতে নেই। তাঁর ইচ্ছাতেই আমাদের সংসার আলোকিত হবে। আগমন ঘটবে নতুন অতিথির। তোমার কি ইচ্ছে হয় না, বাবা ডাক শোনার!

– এখন আমি মোটেই প্রস্তুত না এসবের জন্য। কে খুশি হবেন, কে হবেন না, তা ভাবার কিংবা জানার দরকার নেই আমার। শাহেদও চিৎকার করে জানায় রোদেলাকে।

– কেন প্রস্তুত নও। কীসের পিছুটান আমাদের, কীসের অভাব? সৃষ্টিকর্তার দয়ায় বেশ ভালো আছি আমরা। কেবল একটি ছোট্ট মুখেরই অভাব আমাদের সংসারে। রোদেলার মুখে হতাশার চিহ্ন ফুটে ওঠে।

– আমি তোমাকে এখন ব্যখ্যা দিতে পারবো না রোদেলা। সবকিছু গুছিয়ে উঠতে আমার আরও কয়েক বছর লাগবে, ছেলে হিসেবে পরিবারে আমার একটা দায়িত্ব আছে।

– বাবা হিসেবে তোমার অনাগত সন্তানের প্রতি কোনো দায়িত্ব নেই? প্রশ্ন করে রোদেলা।

শাহেদের মুখে নরম সুর। দেখো রোদেলা তুমি অনেক ভালো ও লক্ষ্মী একটা মেয়ে। পুরো পরিবারটাকে কত সুন্দরভাবে আগলে রেখেছো। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, এ সন্তানটা আমরা এখন নিব না। আগামীকাল আমরা ডাক্তারের কাছে যাবো। তুমি রেডি থাকবে, আমি অফিস থেকে এসে নিয়ে যাবো। এ ব্যাপারে কারো সাথে শেয়ার করার দরকার নেই।

এবার রোদেলা চুপ করে থাকে। বুকের ভেতর থেকে দুমড়ে মুচড়ে কেবলই কান্না আসে। শাহেদকে ভীষণ অচেনা মনে হচ্ছে রোদেলার। অথচ সাত বছরের ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো ওদের। একবারের জন্যও মনে হয়নি শাহেদ এতটা নিষ্ঠুর! অথচ আজ সে তার ঔরসজাত সন্তানকে নিঃশেষ করে দিতেও এতটুকু দ্বিধা করছে না। অথচ এই শাহেদের সাথে সামান্য একটা পিঁপড়া মারাকে কেন্দ্র করে অনেকবার ঝগড়া হয়েছে! অনেক স্বপ্ন নিয়ে রোদেলা সংসার শুরু করেছিলো শাহেদের সাথে। রোদেলা সব সময় মনে মনে ভাবতো, চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর একটি মেয়ে আসবে ওদের সংসারে। ওকে নিয়ে সারাটাদিন কেটে যাবে রোদেলার। আজ যখন সে স্বপ্নের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রোদেলা, তখন সব মিথ্যে মনে হচ্ছে রোদেলার। সারাটিদিন কান্না ও দুশ্চিন্তায় কেটে যায় রোদেলার। পরদিন পুরুষশাসিত সমাজে শাহেদের অমানবিক চাপে পড়ে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবরশন করতে বাধ্য হয়েছিলো রোদেলা।

এরপর জীবন থেকে হারিয়ে যায় আরো পাঁচটি বছর। নিসঙ্গতা যখন দুজনকে কুরে কুরে খাচ্ছিলো তখন শাহেদ রোদেলাকে কিছু একটা করতে বলে। রোদেলার এখন আর কোনোকিছুই ভালো লাগে না। মনে হয়, সবকিছু যেন স্থবির হয়ে আছে। চারদিকে যেন শুধুই শূন্যতা। তারপরেও রোদেলা শুরু করে কর্মজীবন। দিনশেষে দুজনে বাসায় ফিরে অনেকক্ষণ চুপ থেকে ধীরে ধীরে কথোপকথন শুরু করে। শাহেদ এখন 'বাবা' ডাক শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে কত ডাক্তার, দোয়া, মানত করছে। কিন্তু কিছুতেই যেন তার বাবা হবার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে না। মা না হবার কষ্টটা এখন রোদেলা যেভাবে অনুভব করে, শাহেদও তা যেন বুঝতে পারে। মানুষের জীবনের সব কষ্টগুলো সবার সাথে শেয়ার করা যায় না। নিরবে অশ্রু ঝরে শাহেদ ও রোদেলার। টাকা-পয়সা, বিত্ত-বৈভব সব আছে তাদের। কেবল সংসারে একটি ছোট্ট মুখের অভাব। কিন্তু দিন শেষে যেন রোদেলাই কষ্টটা বেশি অনুভব করে। 'মা' না হবার কষ্ট না, একটি সুন্দর প্রাণের স্পন্দনকে বিকশিত হবার আগেই, পৃথিবীর আলো-বাতাসের সংস্পর্শের পূর্বেই অত্যন্ত স্বজ্ঞানে এবরশন নামক হীন মানসিকতায় নির্মমভাবে হত্যা করার কষ্ট! রোদেলার এ কষ্ট পৃথিবীতে আর কেউ বুঝতে পারে না। প্রকৃতি যেন নিজ হাতে এ হত্যাযজ্ঞের প্রতিশোধ নিয়েছে। আজ শাহেদ একটি ছোট্ট মুখে 'বাবা' ডাক শোনার জন্য যেন তীর্থের কাকের মতো প্রতীক্ষায় বসে থাকে প্রতিনিয়ত। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এখন রোদেলা তাকে সে সুসংবাদ শোনাতে পারে না, যা শুনিয়েছিলো পাঁচ বছর পূর্বে।

রোদেলা অনুভব করে, প্রায় প্রতি রাতে স্বপ্নে দেখা নূপুরের ঝুনঝুন শব্দে ছুটোছুটি করা ছোট্ট সে মেয়েটিই যেন রোদেলার এক সময়ের প্রাণের স্পন্দন, যে এখন তার জীবনের এক অব্যক্ত কষ্ট। রোদেলাকে তার এই কষ্ট ও অতৃপ্তি নিয়ে হয়তোবা বাকি জীবনটা চলতে হবে। কাউকে বুঝাতে পারবে না তার এই রোদেলা স্বপ্নের কথা।

মনে রেখো

কাজী মহিউদ্দিন
গ্রুপ সিইও
ব্যাবিলন গ্রুপ

মনের কোণে ছোট্ট একটু জায়গা হলেই–
আমার চলে।
তুমি যখন ঘরময় ব্যস্ত ঘুরে, কাজ করতে
হাঁপিয়ে ওঠো
বা, অনেক ভালোবাসায় ভাসো
হঠাৎ আমার বলা কোনো কথা মনে করে
একটু হেসো
বা আলমারি খুলে লাল জামদানিটা
হঠাৎ দেখে
আলতো হাত বুলিয়ে আমায় ভেবে আনমনা–
হও
রান্না চুলায় নুন চেখে দেখতে গিয়ে, তোমার
মনে পড়ুক ওটা আমার ভীষণ প্রিয়
হঠাৎ ভীষণ হাঁচি পেলে, ভেবো আমি তোমায়
ভাবছি কি!
বুকশেল্‌ফে সঞ্চয়িতার মলাট মুছতে আমার
আবৃত্তি তোমার কানে বাজুক
হঠাৎ দূরে কোথাও ঠিক আমার মতো কারো
গলা শুনে তুমি চমকে ওঠো
স্নানের ঘরে পানির গামলায় নিজের মুখ
দেখে, কপালের টিপ সরাতে আমায় ভেবো
এভাবেই তুমি আমিহীন দিনে
বুকে আগলে আমায় মনে রেখো।

ব্যাবিলন

বৃষ্টি রানি
সিনিয়র অপারেটর, সুইং সেকশন
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

ব্যাবিলন আছে বলে
হাজারো জনতা শ্বাস নিচ্ছে প্রাণভরে,
ব্যাবিলন তুমি ধন্য
দরিদ্র শ্রমিকদের জুটিয়ে দিচ্ছ অন্ন।

গরিব বলে সমাজ যাদের দিয়েছে তাড়িয়ে
ব্যাবিলন তুমি দিয়েছো তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে,
ব্যাবিলন তোমার গুণের কথা
লেখায় হবে না শেষ কিন্তু ফুরিয়ে যাবে খাতার পাতা।

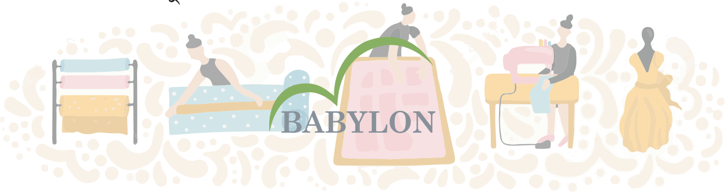

ব্যাবিলনের মতো সুযোগ সুবিধা
আর কি কেহ পাবে কোথা,
ব্যাবিলন তুমি মায়ের সমান
সহস্র শ্রমিকদের বাঁচিয়েছ প্রাণ।

ব্যাবিলন তুমি অমর হও যুগ যুগ ধরে
সব মানুষে বলে– ব্যাবিলন তুমি যাও এগিয়ে,
আমরা সবাই গর্বিত
ব্যাবিলন তুমি আমাদের অন্তরে জাগ্রত।

ডায়েরির পাতায় অপেক্ষা

মো. ফরহাদ হোসেন নির্জন
অফিসার, মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

স্রোতস্বিনী নদীর মতো জীবন বহমান,
যার গন্তব্য অজানা।
তবুও অবিরাম পথ চলা
একদিন হয়তো থেমে যাবে এই পথ চলা
কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাবে অস্তিত্ব
থেকে যাবে শুধু কিছু স্মৃতি বিস্মৃতির জগতে
যদি কোনো বসন্তের উদাস দুপুরে
বা বৃষ্টিস্নাত জোছনা রাতে
মনে পড়ে আমায়
তবে একটু কষ্ট করে ক্ষীণ প্রদীপ জ্বেলে
দেখো এই ডায়েরি খুলে।
দয়া করে দেখ নিও একবার
যখন আমি থাকবো না এই পৃথিবীতে
চির নিদ্রায় থাকবো পরে।
কালের অন্ধকারে, ঘুমে বিভোর হয়ে
ফিরবো না আর কোনোদিন এই পৃথিবীতে
থাকবো না বসে আর ঐ বেলকুনির পাশে
লিখবো না আর কবিতা
এই ডায়েরির পাতায়
দেবো না আর কোনো দুঃখ তোমায়।
যদি মনে পড়ে যায়
অশ্রু ঐ চোখের পাতায়
দেখো চেয়ে ঐ চাঁদ তারায়
দেখবে আমি আছি আজও তোমার অপেক্ষায়।

প্রস্ফূটিত প্রত্যয়ন !

সজীব কুমার সাহা
প্রাক্তন সিনিয়র ম্যানেজার, অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

ধরণির মাঝে বৃক্ষতলে
সঙ্গোপনে চুপটি মেরে
থাকবো দুজন বসে,
দুজনের মুখে রবে না বুলি
আর থাকবে কিছু মিষ্টি অলি
পুষ্প বাগান থাকবে কিছু পাশে।
থাকবে কিছু রজনীগন্ধা
শুভ্র আকাশি কিছু রঙিন সন্ধ্যা
আর থাকবো শুধু তুমি আর আমি,
সঙ্গী হবে খোলা আকাশ
আর পাশে বহিবে নির্মল বাতাস
প্রতিটি মুহূর্ত যেন সবচে দামি।
থাকবে না কোনো কথার বাহার
রইবে শুধু জোৎস্না আঁধার
আর কিছু পুষ্পকলির মালা,
থাকবে শুধু চারটি আঁখি
ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসি
হৃদয়ের দ্বার থাকিবে যে খোলা
ভুবন থেকে অনেক দূরে
ভাসবো দুজন আদিম সুরে
সঙ্গী হবে শুধু শঙ্খচিলের দল,
লোকালয়ের পাশ কাটিয়ে
হারিয়ে যাবো তোমায় নিয়ে
দলছুট মেঘ দিয়ে যায় বল।

সন্ধ্যার অভিসার

শাহজালাল মিয়া পলাশ
সিনিয়র ম্যানেজার, ইনফরমেশন টেকনোলজি
ব্যাবিলন গ্রুপ

মনে পড়ে, সেই সন্ধ্যার ঝুম বৃষ্টি যেন থেমে গিয়েছিলো হঠাৎই
রুদ্র রোদের প্রখরতা? সেতো ম্লান, সন্ধ্যার বাদল বরিষণে।
তাছাড়া সন্ধ্যা তার চির-চেনা রূপে ছিলো দৃঢ় আর
তোমার চোখে ছিলো ভয় জড়ানো বিচ্ছেদের বেদনা,
ঠোঁটে অব্যক্ত, অপ্রকাশিত হাসি।
তখনো যেন খানিকটা ছুঁয়ে ছিলো আঁধার
ঠিক আলোও বলা যায় না তাকে
চলছিলো অদ্ভুত এক আলো আঁধারের খেলা
ধরণীর মাঝে বইছিলো নির্মল প্রসন্নতা
যেন কোনো নতুন বইয়ের উন্নত প্রচ্ছদ।
অভিসারের সময় ছিলো বাঁধা।
তার উপর প্রিয় মানুষ কাছে পাওয়ার অশেষ আমদে
সময়টা যেন হয়ে উঠলো আরো সংক্ষেপ আর সংকুচিত।
যাবার ক্ষণে তুমি আমার হাতে হাত রেখে বলেছিলে,
মিলনের ক্ষণ বড় অবিবেক আর
বিরহ বিচ্ছেদের ক্ষণ দীর্ঘ প্রশস্ত
যেন অকরুণ হয়ে চেপে ধরে নিঃশ্বাসের মূলে।
তোমার কথার কোনো উত্তর ছিলো না আমার কাছে
তোমার চলে যাবার ব্যাকুল বিষাদে
পরিপূর্ণ ছিলো অন্তর।
আবার দেখা হবে তো? এমনি করেই...

সীমানা ছাড়িয়ে

মো. গোলাম মাওলা
প্রজেক্ট ম্যানেজার
নিউজেন টেকনোলজি লিমিটেড

সব করেছি তুচ্ছ; খুঁজি একমনে সীমানা ছাড়িয়ে!
জানি এ খোঁজা কোনো কালেই হবে না শেষ
তবুও আনমনা, তোমাকে পাবো বলে;

দিনের রৌদ্রতাপে ওই দূর দিগন্তের নীলিমায়,
নিকষ কালো আঁধার রাতে আকাশ ভরা সকল তারার মাঝে,
শরতের স্তব্ধ দুপুরে আকাশজুড়ে শুভ্র মেঘের ফাঁকে ফাঁকে!

মেঘবৃষ্টির নিবিড় মেঘ কোণে ও বাদল ধারার মাঝে,
বসন্তের গহীন অরণ্যে বুনোফুল ও মুকুলের ঝাড়ে,
সাগরের ঢেউয়ের সাথে ভেসে আসা বালি চাদরে!

ওই দূর বাঁশরীর বাঁশির করুণ সুরে,
পড়ন্ত বেলার গোধূলির ধুলায় ঘেরা রঙে
পৌষের হিম সকালে শিশির ফোটায় ধুয়ে যাওয়া পত্র-পল্লবে!

তুমি শূন্য এই খোঁজাতেই আমার আনন্দ
আনমনে রই ছুব বলে পুলকিত পরশে,
নিবে আমায় সাথে করে কোনো এক অন্যভুবনে!

প্রাক্তন

রুমানা আক্তার
সিনিয়র অফিসার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

"ঠিক সময়ে অফিসে যায়?
ঠিকমতো খায় সকালবেলা?
টিফিনবাক্স সঙ্গে নেয় কি?
না ক্যান্টিনেই টিফিন করে?
জামা কাপড় কে কেচে দেয়?
চা করে কে আগের মতো?
দুগগার মা ক'টায় আসে?
আমায় ভোরে উঠতে হতো..."

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে এক কাপ কফি হাতে ব্যালকনিতে বসে জয় গোস্বামীর 'প্রাক্তন' কবিতাটি পড়ছিলো মিমি। কবিতার লাইন ক'টা পড়তে পড়তে কখন যেন হারিয়ে গিয়েছিলো নিজের অতীতের মাঝে। সম্বিত ফিরতেই তড়িঘড়ি করে উঠে পড়ে সে তৈরি হবার জন্য। সকাল ৯:৩০ এ ক্লায়েন্ট মিটিং, কোনোভাবেই দেরিতে পৌঁছানো যাবে না সেখানে। যদিও কাল রাতেই মিটিংয়ের সব কাগজপত্র রেডি করে রেখেছে মিমি। এখন শুধু নিজে রেডি হওয়া আর নাস্তা তৈরি করাটা বাকি। তা একার সংসারে নিজের জন্য নাস্তা বানানো কী আর এমন ব্যাপার। আসলে কী, এসবই হলো অভ্যাস; চার বছরের বিবাহিত জীবনের অভ্যাস থেকে কি আর সহজেই বের হওয়া যায়! তবুও মিমির গত এক বছরের এই ব্যাচেলর লাইফ আপাতদৃষ্টিতে ভালোই চলছে, শুধু মাঝে মধ্যে মনের কোণে বিষণ্ন মেঘেরা উঁকি দিয়ে যায়– এটুকুই যা ছন্দপতন।

ক্লায়েন্ট মিটিং শেষ হতে হতে দুপুর দুইটা, ততক্ষণে পেটের মধ্যে ছুঁচোর ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেছে। সেই কোন সকালে দু'স্লাইস ব্রেড খেয়ে বেরিয়েছে মিমি! অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে লিফটের সামনে এসে দাঁড়ায় সে। হঠাৎই খেয়াল হলো ওর পাশেই অনিক দাঁড়িয়ে আছে। লিফটের জন্য অপেক্ষা করছে। মিমির একদমই মনে ছিলো না এই বিল্ডিংয়েই অনিকের অফিস। একটু বিব্রত বোধ করলেও মিমি অনিককে দেখে মাথা নাড়িয়ে হাসলো। অনিকও প্রত্যুত্তরে হাসলো। যেদিন সংসার ছেড়ে মিমি শেষবারের মতো বেরিয়ে এসেছিলো, সেদিন ও অনিককে বলেছিলো– 'যদি কখনো আমাদের রাস্তাঘাটে বা অন্য কোথাও দেখা হয়ে যায়, আমরা দুজনেই চেষ্টা করবো সভ্য মানুষের মতো আচরণ করতে। আফটার অল

স্বামী-স্ত্রী হবার আগে আমরা দুজন খুব ভালো বন্ধু ছিলাম!' সে বন্ধুত্ব রক্ষার্থেই হয়তো লিফটে উঠে অনিক প্রথম কথা শুরু করলো। জানতে চাইলো মিমি তার অফিসে কার কাছে এসেছিলো। কিছু সাধারণ বাক্যালাপ শেষে অনিক মিমিকে বলল, কাছেই এক রেস্তোরায় লাঞ্চ করতে যাচ্ছি। তোমারও নিশ্চয় লাঞ্চ করা হয়নি এখনো। যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে আমরা আজ একসাথে দুপুরের খাবারটা খেতে পারি।
অনিকের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারে না মিমি।

অফিস পাড়ায় লাঞ্চ টাইমে রেস্টুরেন্টগুলোতে উপচে পড়া ভিড়। একটু অপেক্ষা করে একটি খালি জায়গা দেখে অনিক মিমিকে নিয়ে বসে পড়লো। অতঃপর–
"দুজনে মুখোমুখি, গভীর দুখে দুখি,
আকাশে জল ঝরে অনিবার–
জগতে কেহ যেন নাহি আর..."

ওয়েটারের ডাকে দুজনে বাস্তবে ফিরে এলো।
ওয়েটার– স্যার, আপনাদের অর্ডারটা?
অনিক – একটা কাচ্চি আর একটা মোরগ পোলাও। দুইটা বোরহানিও দিবেন প্লিজ। ওহ, তুমি তো আবার বোরহানি খাও না। একটা স্প্রাইট আর একটা বোরহানি দিবেন।
মিমি – না, না। ঠিক আছে। আমি এখন বোরহানি খাই।
অনিক ওয়েটারকে দুটো বোরহানি দিতে বললো।

অর্ডার দিয়ে মিমি ভাবছে– অনিক তাহলে এখনও তার পছন্দ-অপছন্দের কথা মনে রাখে!
অনিক– তুমি আর বোরহানি! এটাও সম্ভব!
মিমি– হ্যাঁ, এখন খাওয়া শিখে গেছি। তুমি কি এই রেস্টুরেন্টে প্রায়ই আসো?
অনিক– মাঝে মাঝেই লাঞ্চ করতে আসা হয়।
মিমি– কিন্তু তুমি তো বাইরের খাবার খেতে পারতে না।
অনিক– ঘরে খাবার রান্না না হলে তো বাইরেই খেতে হবে।

অনিকের মনে পড়ে, বিয়ের পর প্রথম প্রথম অনিকের জন্য লাঞ্চ রেডি করে দিতে পারতো না মিমি। তাই অনিকের এক কলিগ ওকে বলেছিলো– 'আগেই কইছিলাম ভাই, মিডিয়ার মাইয়া বিয়া কইরেন না। এরা রিল লাইফ আর রিয়েল লাইফের পার্থক্য বুঝে না। তখনতো শুনলেন না আমার কথা, এবার বিয়ের পরেও ব্যাচেলরগো মতো রেস্টুরেন্টের রান্না খান; বউয়ের হাতের রান্না আর আপনার কপালে নাই।'

অনিক– জানো মিমি, আমি এখন প্রতিদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠি, জগিং করি, নাস্তা বানিয়ে খাই, তারপর অফিসে যাই। তুমিতো এমনটাই চাইতে! এখন আমার ওয়েস্ট সাইজ

৩৬ থেকে ৩৩ হয়ে গেছে। আর রাতে নাক ডাকার সমস্যাটাও নেই। তুমি ঠিকই বলতে 'এক্সারসাইজ করলে ফিট থাকা যায়।'
মিমি– তুমি তো খেয়ালই করলে না, আমি শাড়ি পড়েছি। এখন প্রায়ই পড়ি।
অনিক– তোমাকে সব সময় শাড়িতে সুন্দর লাগে। জানো আমি এখন একদম বদলে গেছি। এখন আমি গোসল করে ভেজা টাওয়েল বিছানায় রাখি না, ব্যালকনিতে রাখি। নোংরা কাপড় এখানে সেখানে না রেখে ওয়াশিং মেশিনে দেই। অফিস সেরে সরাসরি বাসায় ফিরি, বন্ধুদের আড্ডায় যোগ দেই না। বাসায় ফিরে মোজা খুলে জুতার মধ্যে রাখি, তারপর জুতা স্যু-র‍্যাকে তুলে রাখি।
মিমি– শুনলাম তোমার প্রমোশন হয়েছে?
অনিক– হুম, ব্যাংক লোনগুলোও শোধ করে ফেলেছি।
বাদ দাও আমার কথা, তারপর বলো রাজীব কেমন আছে?
মিমি– রাজীব?
অনিক– শুনেছিলাম তোমার সাথে এনগেজমেন্ট হয়েছে।
মিমি– ওহ, আসলে ঐ সম্পর্কটা ঠিক কাজ করেনি। চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু মনে হয় আর কারো সাথে ঘর বাঁধতে পারবো না কোনোদিন। তুমি সব সময় বলতে না যে, আমি ভীষণ জেদি, একরোখা। এখন আমি আর আগের মতো নেই। সব সময় হাসিখুশি থাকি, আর অন্যকেও হাসিখুশি রাখার চেষ্টা করি। কেবল তোমাকেই খুশি রাখতে পারলাম না।
অনিক– জানো, আজকাল আমিও মাঝে মাঝে তরকারিতে লবন বেশি দিয়ে ফেলি। শুধু শুধুই তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতাম আমি। চাকরি করে ঘর সামলানো ঠিক ততটা সহজ নয়, যতটা আমি ভাবতাম। গত এক বছরে আমি বুঝেছি মিমি, তুমি ছাড়া আমাদের বাসাটা যেন ঠিক বাসা নয়– একটা ঠিকানা মাত্র।
মিমি– আমি আমাদের বাসাটা খুব মিস করি। আমাদের বেডরুম, ব্যালকনিতে একসাথে বসে চা খেতে খেতে গল্প করা, রান্নাঘর, বারান্দার গাছগুলো... সেগুলো কি এখনো আছে নাকি সব মরে গেছে!
অনিক– আমি রোজ সকালে পানি দিই। গাছগুলো ভালোই আছে।
মিমি– আচ্ছা ঠিক আছে, আজ তাহলে উঠি।

অনিক ভাবে, মিমি যদি একবার ওর দিকে ফিরে তাকায় তাহলে অনিক নিজের ভুল স্বীকার করে ওকে সারাজীবন পাশে থাকার অনুরোধ করবে। যেতে যেতে মিমি ভাবছে, অনিক তাকে একবার অনুরোধ করলেই সে অনিককে ক্ষমা করে দিয়ে আবার নতুন করে শুরু করবে। তারপর দুজনের দূরত্ব ক্রমশ দীর্ঘতর হয়, একসময় পথের বাঁকে মিলিয়ে যায় অনিক এবং মিমি।

রহস্যময়ী নীলচোখ

মো. মহসীন
গ্রুপ জেনারেল ম্যানেজার, একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স/ ট্রেজারি
ব্যাবিলন গ্রুপ

সেদিন এমনিই বর্ষা ছিলো, আকাশ জুড়ে ছিলো মেঘের ঘনঘটা। হঠাৎ ঝুপ করে বৃষ্টি নেমে গেলো। ভাঙা ছাতার ফাঁক দিয়ে শরীর ভিজে যাচ্ছে। ভাবছি এবার টিউশনির টাকাটা পেলে একটা ভালো দেখে ছাতা কিনে নিবো। আজ শেষ পরীক্ষা। কোথায় যেন পড়েছিলাম, শেষ ভালো যার সব ভালো তার, আর ইন্টারমিডিয়েটটা জীবনের লক্ষ্যের প্রথম সিঁড়ি। পরীক্ষা শেষে আবারও কাক ভেজা ভিজে বাসায় ফিরে, দুপুরের খাবার না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আসলে মা বেঁচে থাকলে হয়তো না খেয়ে ঘুমোতে দিতো না। আমি যখন ক্লাশ ফাইভে পড়ি, তখন আমার মা মারা গেলেন। বাবাকে বাধ্য হয়ে আবার বিয়ে করতে হলো। বাবা নতুন আম্মাকে পরিচয় করে দিয়ে বলেছিলেন, তোমার নতুন মা। কিন্তু আমি তাকে আম্মা বলে ডাকি, কারণ আমার আপন মাকে "মা" ডাকতাম বলে, ওই ডাকটা তার জন্যই রেখে দিয়েছি।

বিকেলে ঘুম ভাঙার পর ভীষণ ক্ষুধা অনুভব করছি। সাহস হলো না আমার নতুন আম্মাকে ঘুম থেকে তুলে, খাবারের কথা বলতে। বাইরে বেরিয়ে নিজের এলাকাটাকেই অপরিচিত মনে হচ্ছে। এই দু'মাস এত ব্যস্ত ছিলাম পরীক্ষা নিয়ে, কোনোদিকে খেয়াল করার মতো ফুরসত ছিলো না। পাউরুটি আর কলা কিনে, নদীর ধারে কাশবনে বসে খেলাম। মা মারা যাওয়ার পর থেকে ক্ষুধা লাগলেই কাশবনের মধ্যে বসে বসে নিজের মতো করে কখনও চানাচুর-মুড়ি কখনও কলা পাউরুটি, কখনও বিস্কিট খাই। আমার কষ্টের দিনের কথা ভেবে মনটা আবারও খারাপ হয়ে গেলো।

আহারে জীবন! এই কাশবনের মধ্যে কত স্বপ্নের মৃত্যু, কত চোখের পানি, কত লক্ষ স্মৃতি জড়িয়ে আছে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে, কিন্তু আজও ছোটবেলার মতো লুকিয়ে কাঁদলাম। দুপুরের রোদ হেলে এরই মধ্যে বিকেল হয়ে গেলো। নদীর পাশের ম্যাঠের মধ্যে চেঁচামেচির শব্দ শোনা যাচ্ছে, বিকেলে ফুটবল খেলতে মনে হয় সবাই চলে এসেছে। কতদিন ফুটবল খেলি না। মাঠে যেতেই বন্ধুরা আমাকে দেখে বললো, কিরে মাঠে আসাই বন্ধ করে দিলি? মনে হয় তুই ছাড়া এলাকায় আর কেউ পরীক্ষা দেয়নি। ওদের কী করে বলি

আমার জীবন আর দশটা ছেলের মতো নয়। আমাকে যে করে হোক লেখাপড়া করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।
হঠাৎ বন্ধু আকিন একপাশে সরিয়ে নিয়ে বললো, দোস্ত একটা দারুণ খবর আছে! একটা নতুন মেয়ে এসেছে এলাকায়, নীলনয়না, দেখেছিস?
কোন নীলনয়না?
আরে দেখিসনি? দেখতে অনেক সুন্দর, নীল চোখ। নাম অপ্সরা।
ও আচ্ছা বলেই, আমি যথারীতি ফুটবল খেলায় মনোযোগ দিলাম। কিন্তু আকিনের সমস্ত মনোযোগ এক জায়গায়। কোথায় নতুন কোন সুন্দরি মেয়ে আসলো, কীভাবে কাকে পটাবে, আর কেন যেন মেয়েরা পটেও যায়। একটার পর একটা মেয়ের সাথে ছেলেটা দিব্যি প্রেম করে যাচ্ছে।

মাঠের পাশেই মসজিদের কাছে একটা পানির ট্যাংকি ছিলো, খেলা শেষে ওখানে হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে দাঁড়াতেই, হঠাৎ তার চোখে আমার চোখ পড়ে গেল, আসলেই নীল চোখ, ইংরেজিতে মনে হয় "ক্যাটস আই" বলে। লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিলাম। এমন নীল চোখ আমি জীবনে প্রথম দেখলাম।

এর মধ্যে ব্যস্ত হয়ে গেলাম, একুশে ফেব্রুয়ারির দেয়াল পত্রিকা নিয়ে। এলাকায় পোস্টার করে, সবাইকে ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে কবিতা, গল্প জমা দেয়ার জন্য সময় বেঁধে দেয়া হলো।

সকালে দরজায় খটখট শব্দ, বিরক্তিতে ঘুম ভেঙে গেলো। দেয়াল পত্রিকার কাজ করে, অনেক রাতে ঘুমোতে গিয়েছিলাম। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি সকাল ৮টা বাজে। ভাবলাম এটা আকিন ছাড়া আর কেউ নয়, আবার সেই একই গল্প, দোস্ত লায়লা আমাকে ফুল দিয়েছে, আজকে জুমা আমাকে খাইয়েছে। কিন্তু আমি জানি খাওয়ার পর বিলটা আকিনই দিয়েছে। পারেও ছেলেটা।

যাক, দরজা খুলেই আমিতো কিংকর্তব্যবিমুঢ়, নীলনয়না সেই মেয়েটি সামনে দাঁড়িয়ে। কী বলবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেলো।
সে বললো, এতক্ষণ ঘুমান আপনি?
আমি সম্বিত ফিরে ঘোর কাটিয়ে বললাম না, না, অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করলাম তো তাই।
তা আপনার দেয়াল পত্রিকার কাজ কতটুকু?
এইতো, ডিজাইনের কাজ শেষ করলাম,
ভেতরে আসতে বলবেন না?
আমিতো ভয় পেয়ে গেলাম। না, ওর কথা শুনে নয়, আমার নতুন আম্মার কথা ভেবে, এত সকালে একটা মেয়েকে আমার ঘরে দেখলে আর রক্ষে নেই।

যাক প্রসঙ্গটা পাল্টে বললাম, ভেতরে সবকিছু ওলটপালট তো!
বললো একটা কবিতা নিয়ে এসেছি, যদি ভালো হয়, আপনার দেয়াল পত্রিকায় ছাপাবেন।
ঠিক আছে দিন।
আচ্ছা আসি বলে এক পলক তাকিয়ে, সে ঝড়ের মতো চলে গেলো ।

যথারীতি দেয়াল পত্রিকা ২১ শে ফেব্রুয়ারি এলাকার হাইস্কুলের গেটে, হাইস্কুলেরই হেডস্যারকে দিয়ে উদ্বোধন করে স্ট্যান্ড করে টানিয়ে দেয়া হলো। সবাই দেয়াল পত্রিকা পড়ার জন্য ভিড় করলো এবং কার কবিতা, গল্প সবচেয়ে ভালো হলো, এই নিয়ে যথারীতি কয়েকদিন এলাকায় আলোচনা, সমালোচনা চলছিলো।
এবার কয়েকদিনের ছুটি তাই টানা কয়েকদিন শুধু ঘুমালাম।

এরই মধ্যে কখন যেন ভলিবল খেলার মাঠ কাটা থেকে শুরু করে খেলাও আরম্ভ হয়ে গেলো। যথারীতি বিকেলে খেলতে নেমে গেলাম। হঠাৎ মাঠের পাশে ফিসফিস করে কে যেন সাকিব ভাই, সাকিব ভাই বলে ডাকছে। তাকিয়ে দেখি জিসান দাঁড়িয়ে। যদিও সে আমার এক বছরের জুনিয়র, কিন্তু আমাকে ও খুব পছন্দ করে।
যাই হোক উত্তরে বললাম, কিছু বলবে কি?
সে বললো, আপনার সাথে আমার একটু কথা ছিলো, খুবই জরুরি।
বললাম, খেলাটা শেষ করে নেই। সে ঘাড় নাড়িয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল। এর মধ্যে খেলায় পুরোপুরি মশগুল হয়ে গেলাম।

হঠাৎ দূরে মানুষের চিৎকারে, আমরা হকচকিয়ে গেলাম, খেলা থামিয়ে দৌড়ে মেইন রোডে গিয়ে দেখি, জিসান রাস্তায় পড়ে আছে, পাশে একটা সাইকেল, কিন্তু ভেঙ্গে একাকার। জানতে পারলাম, সাইকেলটা নিয়ে মেইন রাস্তায় উঠার পরই একটা ট্রাক ওকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে গেছে। আমিতো অবাক, একটু আগেও দেখলাম সে ভলিবল কোর্টের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে, আমার কাছে কিছু জরুরি কথা বলবে বলে। যাইহোক, একটা বেবি টেক্সি থামিয়ে আমরা কয়েকজন ধরাধরি করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলাম, সাত দিন কোমায় থেকে মৃত্যর সাথে পাঞ্জা লড়ে মারা গেলো। এলাকায় আনা হলো। জোহরের নামাজের পর জানাজা পড়ে আমরা কবরস্থানের দিকে রওনা দিতেই আমার চোখ পড়লো অপ্সরার উপর, তাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মনে হচ্ছে ওর নিকট আপনজন কেউ মারা গেছে। দাফন সেরে এলাকায় ফিরে দেখি অপ্সরা এখনও ঠাঁয় দাড়িয়ে তাদের বারান্দায়, মেইনরোড থেকে এলাকায় ঢুকতে প্রথমেই ওদের বাসাটা পড়ে। যাইহোক, আমাকে দেখে তার ফুঁপানো কান্না আরো বেড়ে গেলো। যেহেতু ওর সাথে আমার তেমন একটা কথা বা অতটা ঘনিষ্ঠতা নেই, তাই সান্ত্বনা দেয়াটা কেমন যেন বাড়াবাড়ি মনে হলো। তাই যথারীতি বাসায় ফিরে গেলাম।

সময় যেহেতু বহমান, এরই মধ্যে শোক সামলে সবাই আবার স্বাভাবিক জীবনে ব্যস্ত হয়ে গেলো। চারিদিকে শীতের আবেশ শুরু হওয়ার সাথে সাথে, আমিও বন্ধুদের সাথে ব্যাডমিন্টন খেলা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। আমাদের এলাকার আরেক জুনিয়র ছেলে "জুয়েল" নতুন স্পোর্টস সাইকেল কিনে, মাঠের চারপাশে রাউন্ড দিচ্ছিলো। খুব দামি সাইকেল, স্পিড বাড়ানো এবং কন্ট্রোলের জন্য আলাদা গিয়ার, আমিতো কল্পনাই করতে পারি না এমন একটা সাইকেল কেনার। যাইহোক, খেলার ফাঁকে ফাঁকে যে সুযোগ পাচ্ছে একবার করে চালাচ্ছে, আমি নিজেও এক চক্কর দিলাম।

এরইমধ্যে আমি ব্যাডমিন্টন খেলায় ব্যস্ত হয়ে গেলাম। হঠাৎ দূরে মানুষের হৈ চৈ এবং চিৎকার শুনতে পেলাম। সেইদিনের ঘটনার মতো দৌড়ে মেইন রোডে গিয়ে দেখি, জিসানের ঘটনারই পুণরাবৃত্তি। আমাদের এলাকারই আরেক জুনিয়র "আশিক" রাস্তায় পড়ে আছে, পাশে ভাঙাচোড়া জুয়েলের নতুন সাইকেল। জুয়েলকে অনুরোধ করে এক চক্কর দেয়ার কথা বলে মেইন রোড়ে উঠতেই একটা ট্রাক ধাক্কা দিয়ে চলে গেছে। স্পট ডেড। এলাকাতে আবারও শোকের ছায়া, অল্পদিনের মধ্যেই দু'দুটো তাজা প্রাণ ঝরে গেলো। জানাজা পড়ে সবাই যখন ওর লাশ নিয়ে কবরের উদ্দেশ্যে রওনা দিবে, হঠাৎ আমার চোখ অপ্সরার দিকে পড়ল। সেইদিনের মতো সে অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। দাফন সেরে এলাকায় ফিরে দেখি অপ্সরা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে বারান্দায়, আমাকে দেখে তার ফুঁপানো কান্না সেদিনের মতো বেড়ে গেলো। আজকেও তাকে সান্ত্বনা দেয়াটা হয়নি। আমি যথারীতি বাসায় ফিরে গেলাম।

চারিদিকে একটা শোকময় পরিবেশ, সবার মধ্যে একটা চাপা আতংক! যুবক যুবক ছেলেগুলো মারা যাচ্ছে। সেই ভয় এবং আতংক আমার মধ্যেও ছেয়ে গেছে। মাঠে কেউ খেলতে আসে না। আমিও তেমন একটা বের হই না। কারো মনে শান্তি নেই।
দুপুরে বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছি। এর মধ্যে আকিন ঘরে ঢুকে চেয়ারটায় বসলো। তার মধ্যেও আগের মতো সেই ফিটফাট ভাবটা নেই। গায়ে একটা নরমাল টি শার্ট আর পরনে ট্রাউজার।
বললো, আচ্ছা সাকিব একটা জিনিস খেয়াল করেছিস?
বললাম, কি?
জিসান আর আশিকের মৃত্যুতে অপ্সরা তাদের ফ্যামেলি মেম্বার থেকেও বেশী কান্নাকাটি করেছে, এখন পর্যন্ত তার ট্রমা কাটেনি। একটু বেশী বেশী না। আমার কেন যেন রহস্য রহস্য মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, এটাতো স্বাভাবিক ঘটনা, এলাকায় দু'দুটো ইয়াং ছেলের মাত্র ছয় মাসের ব্যবধানে অকাল মৃত্যু হয়েছে। কষ্ট পাওয়াও তো স্বাভাবিক।

আমি হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম, তা তুই যা, ওকে একটু সান্ত্বনা দে, এই সুযোগে একটু ঘনিষ্ঠ হতে পারবি। আকিন উত্তরে বলল আমি কি বসেছিলাম রে। আমি কাছে গেলেই ও কেন যেন বারান্দা ছেড়ে ঘরের ভেতর চলে যায়।
আমি বললাম, এভাবে এই নরমাল ভাবে গেলে চলবে, একটু ফিটফাট হয়ে যা।
তাতো গিয়েছিলাম, কিন্তু কেন যেন বন্ধু ও আমাকে পছন্দ করছে না। আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ে একবার কথা বললে সে আমার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়নি এমন ঘটনা বিরল। তুইতো জানিস।

আমি বললাম লেগে থাক, এখনতো চারিদিকে একটা শোকময় পরিবেশ, সব ঠিক হয়ে যাবে। আকিন চেয়ার ছেড়ে উঠতেই, বললাম কীরে চলে যাচ্ছিস যে?

বললো যাই বন্ধু কিছুই ভালো লাগছে না। ওদের বাসার পাশে একটা চক্কর দিয়ে আসি। পারেও ছেলেটা, এত এনার্জি যে কোখায় পায়, এর দশভাগ যদি ও পড়াশুনায় মনোযোগ দিত, তাহলে অনেক ভালো রেজাল্ট করতে পারতো।

আমি দরজাটা চাপিয়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কখন যে ঘুমিয়ে গেছি টেরও পাইনি। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেলো। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি অপ্সরা সামনে দাঁড়িয়ে।
ভেতরে আসবো?
এতক্ষণে আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। বললাম আসুন, আসুন।
আমার ঘরে একটা কাঠের চেয়ার ছাড়া বসার মতো আর তেমন কিছুই নেই, আর আছে পুরনো একটা চৌকি, যেখানে আমি এতক্ষণ শুয়েছিলাম। ক্লাশ ফাইভে থাকতে আমার মা এই চেয়ারটা আমাকে বানিয়ে দিয়েছিলো গৌরাঙ্গ মিস্ত্রীকে দিয়ে, সাথে একটা পড়ার টেবিল। আগে আমরা ফ্লোরে বসে, চৌকিতে বই রেখেই পড়তাম। এখনতো বিভিন্ন ডিজাইনের খাট বেরিয়েছে, তখন তো চৌকিতেই ঘুমাতাম, পড়তাম, শীতল পাটি চৌকিতে পেতে খেতাম।

যাক অপ্সরা আমার রুমের চারিপাশটা খুব মনোযোগ সহকারে দেখছে। আমিতো লজ্জায় মরে যাচ্ছি। শুনেছি লজ্জা নারীর ভুষণ, এই কথাটা মনে হয় ঠিক নয়। এই মুহূর্তে লজ্জায় মনে হচ্ছে আমি নিজেই মাটির নিচে ঢুকে যাই। চারিদিকে সব অগোছালো, টেবিলে এলোমেলো বই, চৌকিতে পুরনো জামাকাপড় পড়ে আছে। এরি মধ্যে কখন যে অপ্সরা টেবিলের বইগুলো ঘুছিয়ে ফেলেছে খেয়ালই করিনি।

আমাকে বলল উঠুন তো, এত বিকেলে কেউ কি ঘুমায়! আমি উঠে দাঁড়াতেই সে বিছানাটা সুন্দর করে পরিষ্কার করে বিছিয়ে দিলো। বললো এবার বসুন।

আমিতো অবাক। মেয়েটা এত সাবলীলভাবে কথা বলছে, মনে হচ্ছে কতদিনের পরিচয়। ওর নীল চোখে বেশীক্ষণ চোখ রেখে কথা বলা যায় না। ওর চোখের যে গভীরতা আমি দেখেছি, কেন যেন ভালোলাগার সাথে সাথে ভয়ে শরীরটা ঠান্ডা হয়ে যায়।

তাকিয়ে দেখি ও অপলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি অস্বস্তিতে পড়লাম, কী করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বললাম আপনি একটু বসুন, আমি একটু চা নিয়ে আসি। উত্তরে বলল, একটু কেনো, বেশী করে চা নিয়ে আসেন। মেয়েটার সেন্স অব হিউমারও বেশ!

পকেটে কয় টাকা আছে হিসাব করা শুরু করলাম, শুধু তো চা দেয়া যায় না, সাথে তো একটু বিস্কিটও দিতে হয়। তখন নাবিস্কো গ্লুকোজ বিস্কিট এর প্রচলন ছিলো। অপ্সরার বাবা ছিলো ড্রেজার অফিসের চিফ ইঞ্জিনিয়ার, ওদের দামি জিনিস খেয়ে অভ্যেস। চিন্তা করছি নতুন আম্মাকে জিজ্ঞেস করবো ঘরে কোনো বিস্কিট আছে কি না। আইডিয়াটা বাদ দিলাম, কেনো না এনিয়ে আবার একটা ঝামেলা পাকাবে। পকেটে মাত্র আঠার টাকা। এখনও মাস শেষ হতেই চারদিন বাকি। টিউশনির টাকা পেতে পেতে পরের মাসের সাত তারিখ।

কী করবো, কী করবো, এতসব চিন্তা করতে করতে অপ্সরার কথা কানে আসলো। কী ভাবছেন? বসেন তো, আমি মাত্রই চা খেয়ে এসেছি। আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমাদের এই নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনে হিসাব-নিকাশ প্রতিদিনের নৈমিত্তিক ব্যাপার। তা না হলে আমাদের জীবনই চলবে না । আমার এই আঠার টাকা আমার কাছে যক্ষের ধনের মতো।

সুন্দর একটা গন্ধ নাকে আসলো। বুঝলাম অপ্সরার শরীর থেকে আসছে। কী এক মৌ মৌ সুবাসে আমার ছোট্ট ঘরটা ভরে গেলো। আহারে জীবন, আমি সাবান বাঁচানোর জন্য একটা শার্ট তিনদিন পরি যতক্ষণ পর্যন্ত শার্টের ঘামের গন্ধটা সহনীয় পর্যায়ে থাকে। বিছানার চাদরটা যে কতদিন ধরে ধোয়া হয় না, এতক্ষণে খেয়াল করলাম আমি স্যান্টো গেঞ্জি পরে আছি, লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি একটা টি শার্ট পরে নিলাম।

যাইহোক উঠবো, আম্মু আবার খুঁজবে, ওনার সাথে একটু মার্কেটে যেতে হবে, বলেই হনহন করে বেরিয়ে গেলো অপ্সরা। আমি দরজার দিকে তাকিয়ে থাকলাম, ঝড়ের পর পৃথিবী যেমন খমকে যায়, আমার পারিপার্শ্বিকতা সেদিন তেমনই ছিলো।

এরমধ্যে হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সন্ধ্যে ৬টা, আমার টিউশনির সময় অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলাম। মাথা থেকে সবকিছু ঝেরে ফেললাম। কারণ স্বপ্ন আমাদের জন্য নয়। আমাদের জন্মই হয়েছে, দু:খ-কষ্টের সাথে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা। এটাই জীবন। আহারে জীবন!

পরদিন দুপুরের খাবার খাচ্ছি, আসলে আমাদের দুপুর বলতে বিকেল ৪টা। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে তাকিয়ে দেখি অপ্সরা দাঁড়িয়ে। আমি কী বলবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আসবো বলেই, ভিতরে ঢুকে বললো, এত দেরিতে খাচ্ছেন যে । আচ্ছা ঠিক আছে, খেয়ে নিন। আমি হাত ধুয়ে উঠে গেলাম, বললাম পরে খেয়ে নেবো।
বললো তাহলে এই টি শার্টটি পরে নিন।
টি শার্ট!
হ্যাঁ, আপনার জন্যই এনেছি। আপনার পরনের টিশার্টটির পেছনে দু'দুটো ফুটো, খেয়াল করেছেন! সেজন্য দুটো টি শার্ট কিনেছি। নিন তাড়াতাড়ি পরে নিন।
অজান্তে আমার চোখে পানি এসে গেলো। অপ্সরা দেখার আগে লুকিয়ে মুছে ফেললাম।
তারপর মাঝে মাঝে কথা, এসে আমার টেবিল বিছানা গোছগাছ করা থেকে শুরু করে কখন যে দুজন দুজনার বন্ধু হয়ে গেলাম। আমার প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি তার খেয়াল। এ যেন স্বপ্ন দেখছি। কিন্ত ভাগ্যদেবতা ক্রুর হাসি হেসে পরিহাস করে আমাদের মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বপ্নগুলোকে নিয়ে।

যাইহোক, আমার জীবনের নতুন গল্প শুরু হলো। এক পড়ন্ত বিকেলে বন্ধু অহিদের তিনতলা বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে গল্প করছি, হঠাৎ মনে হলো শূন্যে ভাসছি, তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফেরার পর দেখি পঙ্গু হাসপাতালের বেডে। বাম হাত এবং ডান পা ভেঙ্গে গেছে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত পেয়েছি। ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। জ্ঞান ফিরেছে শুনেই আত্মীয়স্বজনসহ অনেকে সেদিন দেখতে এসেছিলো।
দ্বিতীয় দিন সুন্দর একটা গন্ধ নাকে আসলো, চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি অপ্সরা সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বললাম কখন এসেছ?
বলল- অনেকক্ষণ।
আমাকে ডাকলে না কেন? তুমি ঘুমাচ্ছিলে তাই।
তাকিয়ে দেখি ওর চোখে জল, হঠাৎ আমার মাথার কাছে এসে হু হু করে কেঁদে উঠল।
বললাম- কাঁদছো কেনো? আমিতো বেঁচে আছি।
বললো, আমার সাথেই কেন এমন হয়! যাকেই আপন করতে চাই, সেই আমাকে ছেড়ে চলে যায় কেন?

বললাম- আমিতো চলে যাইনি, ডাক্তার বলেছে, ৬ মাসের মধ্যে সুস্থ হয়ে যাবো। সেদিন অপ্সরা অনেকক্ষণ ছিলো, আমাকে নিজের হাতে সাগু, স্যুপ খাইয়েছে, কমলার খোসা ছড়িয়ে কোষগুলো মুখে পুরে দিয়েছে। তারপর সন্ধ্যার আগে চলে গিয়েছিলো। অপ্সরার আমাকে দেখতে আসাটা অনেককে অবাক করেছিলো। এর মধ্যে বন্ধু আকিন অন্যতম। অপ্সরা চলে যাওয়ার পর আকিন আমার কাছে আসলো। বলল, বন্ধু একটা সত্যি কথা বলবি, তোর সাথে অপ্সরার কি কোনো গভীর সম্পর্ক আছে? আমি চুপ করে থাকলাম। দেখ এটা জানতে চাওয়ার একটা কারণ আছে, আমাকে বিশ্বাস করতে পারিস, আমি কাউকে

কিছু বলবো না।
আমি বললাম কী কারণ? শার্লক হোমসের ভূত তোকে আবার তাড়া করেছে, নাকি?
সে চেয়ারটা টেনে আমার মাথার কাছে এসে বলল, শোন সাকিব, আমি যেটা সন্দেহ করছি, জানি না এটা কেউ বিশ্বাস করবে কি না? তার আগে বন্ধু বল তো, তোর সাথে অপ্সরার কোনো প্রেম...
কীসের সন্দেহ আকিন?
তুই জানিস কি না, জিসানের সাথে কিন্তু অপ্সরার প্রেম ছিলো, জিসান হঠাৎ এক্সিডেন্টে মারা গেলো। এরপর আশিকের সাথে ওর সম্পর্ক হলো, আশিকও এক্সিডেন্টে মারা গেলো। এরপর তুইও মারা যেতে যেতে বেঁচে গেলি। তোর সাথে যে একটা সম্পর্ক আছে, তুই না বললেও তা আমি বুঝতে পেরেছি, দুদিন আমি ওকে তোর বাসা থেকে বের হতে দেখেছি। বন্ধু, তুই সাবধানে থাকিস, আমারতো মনে হয় ওর মধ্যে কিছু একটা রহস্য আছে। মাঝে মাঝে ওর নীল চোখে তাকিয়ে দেখিস, ওখানে মনে হয় অন্য কেউ। আমি যখন ইদ কার্ড দিতে গিয়েছিলাম হঠাৎ আমার দিকে এমনভাবে তাকালো, মনে হলো ওটা অপ্সরা নয়, অন্য কেউ। আমি ভয় পেয়ে কার্ড না দিয়ে চলে এসেছিলাম। আমারতো মনে হয় এইসব মৃত্যু অপ্সরার সাথে সম্পর্কিত।
কী বলছিস তুই!
দোস্ত আমি ওর নীলচোখে অন্য কারো চোখ দেখতে পেয়েছি, তুই জানিস আমি নিজে কোনো ভূতপ্রেত, পরী কিংবা জ্বীন বিশ্বাস করি না, ভয়ও পাই না। কিন্তু আমি ওই দিন ভয় পেয়েছিলাম। আর আমি সিউর তুই নিজে অহিদের বাসার তিনতলা থেকে এমনি এমনি পড়িসনি, তোকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে কোন অশরীরি আত্মা। অপ্সরার সাথে যারই সম্পর্ক হবে তার মৃত্যু অবধারিত।

আমিতো সব শুনে অবাক। মাঝে মাঝে আমিও অপ্সরার চোখে কেমন যেন অন্য একটা রহস্যময় চোখ দেখতে পাই। ভেবেছিলাম এটা হয়তো আমার ইলিউশন। আবার গতকালের অপ্সরার কথা মনে পড়লো, সে বলেছিল আমার সাথে যারই ভালো সম্পর্ক হয়, সে আমাকে ছেড়ে চলে যায় কেন?

পরেরদিন দুপুরের পর পরই অপ্সরা আবার আমাকে হাসপাতালে দেখতে এলো। আমার মনে শত হাজারো প্রশ্ন উকিঝুঁকি মারছে। জিজ্ঞেস করলাম অপ্সরা একটা সত্যি কথা বলবে?
বলো।

আচ্ছা তোমার সাথে জিসান এবং আশিকের প্রেম ছিলো, তাই না? ও চুপ করে গেলো। পায়ের আঙুলগুলো দিয়ে তার স্যান্ডেলের ফিতাগুলো নাড়াচাড়া করছে। বললাম, অপ্সরা বললে না যে।
অপ্সরার চোখে জল। ডান হাত দিয়ে চোখ মুছে উত্তরে বললো, হ্যাঁ ছিলো, কিন্তু বিশ্বাস

করো, তোমাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি।
তার চোখে তাকাতেই আমার শরীরে ভয়ের স্রোত বয়ে গেলো, সে অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দুচোখে জল গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু তার ওই নীলমনির ভেতরে আমি আরেকটা চোখ দেখতে পেলাম। হয়তো সবটাই আমার মনের ভুল।
বিদায় নেয়ার সময় ও খুব কান্না করলো, বললো তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে এসো। আর এই সপ্তাহে মনে হয় আসতে পারবো না, আমরা মামার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি পুরো ফ্যামিলি।
এরপর প্রতিটা দিন ওর জন্য আমি অপেক্ষা করি। ভাবি, এই বুঝি এসেই আমাকে জিজ্ঞেস করবে আজ কেমন আছো?

এক সপ্তাহ গিয়ে দুসপ্তাহ চলে গেলো, ওর কোন খোঁজ নেই, আমার অপেক্ষার প্রহর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগলো। অথচ একটা সময় ছিলো অপ্সরা আমাকে এক মিনিটের জন্য চোখের আড়াল হতে দিত না, আজ সে আমা থেকে কোন অজানা কারণে আড়ালে চলে গেলো।

আড়াই মাস পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম। এর মধ্যে খবর পেলাম, অপ্সরারা বাসা চেঞ্জ করে ঢাকার মিরপুরে চলে গেছে। ওর কাছের এমন কাউকে চিনি না, যার কাছ থেকে ওর কোন খোঁজ পাওয়া যায়। আমার দুচোখ শুধু তাকে খুঁজে। ঝড়ের মতো ও আমার জীবনে আসলো, কখন যে সব এলেমেলো করে দিয়ে এক সন্ধ্যায় চলে গেলো। এক জীবনে এত কষ্ট কোথায় রাখি। অপ্সরাই বলতো, কিছু কষ্ট এত বিশাল যা সহ্য করা যায় না, কিছু ব্যথা এতো অসীম যা বুকে রাখা যায় না, কিছু মানুষ এতো আপন হয়ে যায়, যে হারিয়ে গেলে তাকে কখনও ভোলা যায় না। ওর কথাগুলো যে এমনভাবে আমার জীবনের সঙ্গে মিলে যাবে সেটা কখনও ভাবতেই পারিনি।

অজস্র স্বপ্নের ভিড়ে আমি তাকে খুঁজে ফিরি, আমার সমস্ত কল্পনাজুড়ে তার বসবাস। এক বুক আশা নিয়ে তার জন্য অপেক্ষায় থাকি, অপ্সরাই একদিন আমাকে বলেছিলো, এবার হয়তো বাঁচবো তোমায় নিয়ে, হায়! আজ সেই আমাকে ভুলে গিয়ে ঠেলে দিয়ে গেলো গভীর আঁধারে।

আরো বলেছিলো, কাউকে আবেগের ভালোবাসা দিও না, মনের ভালোবাসা দিও, কারণ আবেগের ভালোবাসা একদিন বিবেকের কাছে হেরে যাবে, আর মনের ভালোবাসা চিরদিন থেকে যাবে। আজ সেই ভালোবাসাহীন ছেলেটা আবারও ভালোবাসাহীন হয়ে গেলো। ভীষণ অভিমান হলো অপ্সরার উপর। ভালইতো আমার দিন চলছিলো। কেন আমার এই ছোট্ট জীবনে এসে সব তছনছ করে দিয়ে গেলো।

হাসপাতালে আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলো, লিখেছিলো আমার জীবনে কেউ নেই তুমি

ছাড়া, আমার জীবনে কোনো স্বপ্ন নেই তুমি ছাড়া, আমি কিছু ভাবতে পারি না তুমি ছাড়া। আজ সেই অপ্সরা একদিন আমার জীবন থেকেই হারিয়েই গেলো।
আমি একলা পড়ে রই, একলা আকাশের নিচে, একলা বৃষ্টি ছুঁই। আজও আমার দুচোখ খুঁজে ফিরে তাকে।

হাসপাতাল থেকে ফেরার আরো ছয় মাস পর যখন আমি স্ক্র্যাচ দিয়ে একটু একটু হাঁটা শুরু করলাম। এক বিকেলে নদীর পাড়ে মাঠটাতে হাঁটার প্র্যাকটিস করছিলাম। প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছিলাম। এমন সময় আমার চোখ পড়লো, আরশাদের উপর, যে কি না অপ্সরাদের বাসার কেয়ারটেকার ছিলো।

আরশাদকে দেখে, আমি আকাশের চাঁদ পাওয়ার মতো যারপরনাই খুশি হলাম। দূর থেকে আরশাদ বলে ডাকতেই কাছে আসলো। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে জিজ্ঞেস করলো কেমন আছেন সাকিব ভাই, আপনার পায়ের অবস্থা কেমন? আমি আপনাকে দেখতে আপনার বাসায় যেতাম। সুকানী চাচার কাছ থেকে সব শুনেছি।
সুকানী চাচা!

জানালো, নদীর পাড়ের পুরনো ড্রেজারের সুকানী ওর চাচা হয়। ওনার সাথে দেখা করতে এসেছে। আমার মাথায় শুধু অপ্সরা ঘুরপাক খাচ্ছে।
আমি জিজ্ঞেস করলাম, অপ্সরারা কেমন আছে?
ভালো নেই, সাকিব ভাই। ওর হাজব্যান্ড মারা গেছে।
হাজব্যান্ড, আমি তো অবাক! আরশাদের কথা শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো।
অপ্সরা কী করে পারলো। একদিন সেই বলেছিলো, তুমি আমাকে যতই কষ্ট দাও, আমি তোমাকে কখনো ছেড়ে যাবো না। আমাকে যতই দু:খ দাও, আমি সেই দু:খকেই সুখ ভেবে নেবো। আর সেই অপ্সরা কি না আমার ভালোবাসা ভুলে গিয়ে আমাকে কিছু না বলে হুট করে বিয়ে করলো। আমার সাথে এত বড় ছলনা করল।
হ্যাঁ সাকিব ভাই। ওর মামাতো ভাই জার্মানিতে থাকতো। উনি বাংলাদেশে আসার পর, অপ্সরাকে বিয়ে করে সাথে করে জার্মানি নিয়ে গিয়েছিলো।
আমার বুকটা যেন ভেঙে যাচ্ছে, কষ্টে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আরশাদ দেখার আগেই মুছে ফেললাম।
অপ্সরা বিয়ের কথা কি আগে জানতো?
না, অপ্সরাকে ওর বড় মামার বাসায় বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। সবকিছু আগেই দুই পরিবার ঠিক করে রেখেছিলো। বিয়ের দিন ভীষণ কেঁদেছিলো। বিয়েটা কিছুতেই সে মেনে নিতে পারছিলো না। আপনাকে দেখতে একটিবার হাসপাতালে যাওয়ার জন্য ওর মাকে অনেক অনুরোধ করেছিলো। ওর বাবা-মা রাজি হয়নি। আপনার জন্য মনে

হয় অপ্সরা টি শার্ট কিনেছিলো, এটা নিয়ে ওদের পরিবারে অনেক কথা হয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে জার্মানি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি ঘটনাগুলো ঘটলো, অপ্সরার করার কিছুই ছিলো না।
ওর হাজব্যান্ড মারা গেলো কীভাবে?
কার এক্সিডেন্টে। জার্মানি থেকে বাই রোডে ঘুরতে অস্ট্রিয়া যাচ্ছিলো, ভদ্রলোক নিজেই ড্রাইভ করছিলেন। স্পট ডেড। অপ্সরা অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলো।

এরপর অপ্সরা আপা ভীষণ শক খেলো, ট্রমা হয়ে গেলো। আমেরিকার বোস্টনে ওর বড় বোনের কাছে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছিলো, এখন সেখানেই থাকে।

অপ্সরার জীবনটা বড়ই অদ্ভুত এবং বড় কষ্টের সাকিব ভাই। অল্প বয়সে হাজব্যান্ডটা মারা গেছে। বিদেশ থেকে ফোন করলেই আপনার কথা জিজ্ঞেস করতো। গত মাসে একবার দেশে এসেছিলো যখন ওর দাদি মারা গেলো। আপনার কথা জিজ্ঞেস করলো। বললাম আপা একবার নিজে গিয়ে দেখা করে আসেন। বলল না না, আমি দেখা করলে ওর বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। এটা কোনো কথা সাকিব ভাই, ও নিজেকে অপয়া বলে দোষ দেয়।

সব শুনে আমার শরীর, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। আাকিনের কথা মনে পড়লো, অপ্সরার সাথে যারই সম্পর্ক হবে, কেউ বাঁচতে পারবে না। কিন্তু অপ্সরা কেন বুঝতে চায়নি, আমি কোন অলৌকিকতা কিংবা রহস্যে বিশ্বাসী নই। ওর জন্য আমি শতবার মরতে পারি। পৃথিবীটা সত্যিই রহস্যময়। এর রহস্য বোঝা সত্যিই কঠিন। সত্যটা প্রমাণহীন, কিন্তু সত্যটা সেখানেই। ছোটবেলার "এক্স ফাইলস" ইংরেজি ছবির কথা মনে হলো, ট্রুথ ইজ আউট দেয়ার।

Quality Management System এক জাদুর কাঠি

তানভীর হোসেন
সহকারী ম্যানেজার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

ঘটনা–১। আহমেদ ফ্যাশন্স এ আজ বেশ ঝামেলা হচ্ছে। আজ একটি বড় শিপমেন্ট যাওয়ার কথা। কিন্তু রপ্তানীর সকল কার্টন এখনো ক্লোজ হয়নি। প্রায় চারশত পিস গার্মেন্টস পাওয়া পাওয়া যাচ্ছে না। এ স্টাইল কাটিং এর সময় ২% বাড়তি কাটা হয়েছে। রিজেক্ট এর সঠিক হিসেব আছে। তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার থাকায়, এতগুলো কমপ্লিট গার্মেন্টস চুরি হয়ে যাবে এটাও বিশ্বাসযোগ্য না। পরবর্তিতে তদন্ত করে জানা গেল যে, সুইং হওয়ার পর, সকল গার্মেন্টস সঠিকভাবে গুনে ফিনিশিং এ বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু ফিনিশিং এ কোনো গার্মেন্টস এ অল্টার পাওয়া গেলে, যেগুলো ঠিক করার জন্য আবার সুইং এ ফেরত পাঠানোর সময় লিখিত কোন হিসেব রাখা হয় না। হিসেব রাখার কোন সিস্টেম নেই। একারণে নিখোঁজ গার্মেন্টসগুলো, সুইং নাকি ফিনিশিং, কোথায়, কার দায়িত্বে আছে তা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।

ঘটনা–২। নীরা ফ্যাশন্স খুব সনামধন্য একটি গার্মেন্টস কারখানা। বিভিন্ন অডিটেও কারখানাটির ফলাফল চমৎকার। কিন্তু গত সপ্তাহে একটি সেফটি অডিটে কারখানার ফ্লোরের ফগ-লাইটগুলোর প্রায় অর্ধেকই অকার্যকর পাওয়া গিয়েছে। তদন্তের পর জানা গেলো যে, চার মাস আগে খোরশেদ সাহেব, কারখানায় ফায়ার অফিসার পদে যোগদান করেছেন। এরপর হতে কারখানার ফগ-লাইটগুলো তিনি একবারের জন্যও চেক করেননি। তার আগের কোম্পানিতে ফগ লাইট রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিলো মেইন্টেনেন্স সেকশনের। খোরশেদ সাহেব মনে করেছেন যে, এখানেও ফগ লাইট রক্ষণাবেক্ষণ মেইন্টেনেন্স সেকশনই করে। কিন্তু নীরা ফ্যাশন্স এ, ফগ লাইট রক্ষণাবেক্ষণের কাজ মেইন্টেনেন্স সেকশন কখনও করেনি। পারস্পারিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে, আগের ফায়ার অফিসারই কাজটি করত। একারণে, কারখানার কোনো ফগ-লাইটে গত চার মাস যাবত কোনো ধরনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজই করা হয়নি। ফলাফল, এই বিপর্যয়।

আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন আমার আজকের লেখার বিষয়বস্তু কি। আজ আমি লিখছি Quality Management System (QMS) নিয়ে। বিষয়টির ব্যাপ্তি অনেক বড়। তবে আমি চেষ্টা করব, খুব সহজ ভাষায় QMS সম্পর্কে কিছু বলার, যাতে করে সবাই এর মূল বিষয়টি বুঝতে পারে।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কিছু পলিসি বা নীতিমালা থাকবে। সেই নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য একাধিক কার্যপ্রণালী বা Standard Operating Procedure (SOP) কার্যকর থাকবে। এই এসওপি গুলোই প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকা শক্তি। একটি কোম্পানিতে যত রকম কাজ করা হয়, প্রতিটি কাজই কোনো না কোনো এসওপিতে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন সুইং অপারেটর এর নিডেল ভেঙ্গে গেলে সে কীভাবে স্টোর থেকে নতুন নিডেল নিবে? কোনো শ্রমিক আইডি কার্ড হারিয়ে ফেললে কী করবে? ফিনিশিং থেকে কোনো শার্টে কোয়ালিটি সমস্যা পাওয়া গেলে কী পদ্ধতিতে তা রিপেয়ার করা হবে? কোনো মেশিন কী পদ্ধতিতে কে রক্ষণাবেক্ষণ করবে? অথবা, জানালার গ্লাস কে পরিষ্কার করবে? ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সব কাজের উল্লেখ থাকবে এসওপি তে।

লেখার শুরুতে যে দুটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু অবাক ব্যাপার হলো, দুটি ঘটনার কোনটির জন্যই কারও কোন দায়িত্ব অবহেলা দায়ী নয়। এর কারণ হলো, ঐ কাজগুলো কে করবে সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা ওই প্রতিষ্ঠান দুটিতে ছিলো না। যেহেতু নির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব অর্পিতই হয়নি, সেহেতু দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগও হয়নি। এটি দুর্বল Management System এর উদাহরণ। দুর্বল Management System এর কারণে ঐ প্রতিষ্ঠান দুটোতে প্রয়োজনীয় এসওপি ছিলো না। একারণেই, ফিনিশিং থেকে কোনো অল্টার গার্মেন্টস কিভাবে রিপেয়ার করা হবে? বা, কে ফগ লাইট নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করবে? এ সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা ঐ দুই প্রতিষ্ঠানে ছিলো না। এসওপি না থাকায় কাজও হয়নি, ফলাফল অডিট বিপর্যয়।

যেকোনো কাজ কে, কী পদ্ধতিতে, কখন করবে তা সুস্পষ্টভাবে ঐ কাজের এসওপি তে উল্লেখ থাকবে। প্রতিষ্ঠানের সকল কাজ, তা যত গুরুত্বপূর্ণ বা নগন্যই হোক না কেন, তা অবশ্যই কোনো না কোনো এসওপি তে উল্লেখ থাকবে। প্রতিষ্ঠানে এমন কোনো কাজ থাকবে না যা কোনো এসওপি তে উল্লেখ নেই। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মচারীকে অবশ্যই সঠিক Job Description দেয়া হবে। Job Description এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে যে, তিনি কোন কোন এসওপি বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বশীল। এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন থাকলে কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো কাজই অসম্পূর্ণ থাকবে না। এ পদ্ধতিকেই Quality Management System বলা হয়। QMS এর আরও কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন PDCA Cycle, LEAN, 5S ইত্যাদি। তবে আজ সেসব নিয়ে কোনো আলোচনা করবো না।

ভালো এসওপি এর বৈশিষ্ট্য-

– এসওপির নাম, নাম্বার, কত তম সংস্করণ (ভার্সন) ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ থাকে।
– এসওপিটি কোন কোন নীতিমালার অধীনে সেটি উল্লেখ থাকে।
– এসওপি বাস্তবায়নের জন্য কে দায়িত্বশীল তা উল্লেখ থাকে। অর্থাৎ কোন কোন পদবীর Job Description এর সাথে এটি সংযোজিত হবে, তা উল্লেখ থাকে।

– একটি কাজ কি পদ্ধতিতে করতে হবে, তার প্রতিটি ধাপের বিস্তারিত বর্ণনা থাকে।
– একাধিক এসওপি বিভিন্ন কাজের মাঝে Check & Balance তৈরি করে। অর্থাৎ একটি কাজ সঠিকভাবে করা হলো কি না, তা অন্য কোনো এসওপি দ্বারা যাচাই হবে।

কোনো প্রতিষ্ঠানে QMS না থাকলে যেসব সমস্যা হয় তা হলো-
– কে, কোন কাজ, কী পদ্ধতিতে করবে তা নির্ধারিত না থাকায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।
– ব্যক্তি বিশেষের উপর ভিত্তি করে একই কাজের একাধিক স্ট্যান্ডার্ড সৃষ্টি হয়।
– ব্যক্তি বদলের সাথে সাথে প্রচলিত কর্মপ্রণালীতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, কখনও কখনও ধ্বস নামে।
– ব্যক্তির কর্মদক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার হয় না।
– বারবার একই ভুলের পুণরাবৃত্তি হয়।
– কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন হয় না, স্বজনপ্রীতির সম্ভাবনা থাকে।
– কাজের জবাবদিহিতা থাকে না।
– সহকর্মীদের মাঝে পারস্পারিক সহযোগিতার পরিবর্তে দোষারোপ এর সংস্কৃতি শুরু হয়।
– কর্মচারীদের মাঝে কাজের উৎকর্ষের পরিবর্তে ব্যক্তি তোষামোদ এর সংস্কৃতি শুরু হয়।
– কোম্পানির সম্পদের অপচয় হয়।

কোনো প্রতিষ্ঠানে QMS কার্যকর থাকলে-
– সকল কাজ সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়।
– ব্যক্তি বদল হলেও কোম্পানির কাজের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।
– তুলনামূলক কম দক্ষ জনবল দিয়েও সুষ্ঠুভাবে কর্ম সম্পাদন করা যায়।
– কাজে কোনো সমস্যা হলে দ্রুত তা চিহ্নিত করা যায়।
– কর্মীদের কাজের মূল্যায়ন সঠিকভাবে করা যায়। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির সুযোগ কম থাকে।
– কর্মীদের মাঝে অভিযোগ, অনুযোগ কম সৃষ্টি হয়।
– কর্মীদের পারস্পরিক দোষারোপ, ভুল বোঝাবুঝির প্রবণতা কমে যায়।
– কাজে ভুল কম হয়, একই ভুলের পুণরাবৃত্তি হয় না।
– দায়িত্ব এড়িয়ে চলার প্রবণতা বন্ধ হয়।

এবার দেখি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে QMS এর বাস্তবতা। বহুজাতিক কোম্পানিসমূহের প্রায় সবগুলোতেই Quality Management System কার্যকর রয়েছে। কিন্তু দেশীয় কোম্পানিসমূহের খুব অল্প কয়েকটিতেই QMS আছে। বাংলাদেশে হয়তো হাজারে একটি প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়াও কঠিন হবে, যেখানে পলিসি, এসওপি ও জব ডেসক্রিপশনের সঠিক সমন্বয় রয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছতে না পারার মধ্যে

অন্যতম উল্লেখযোগ্য কারণ এটি। এদেশের প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে QMS কার্যকর করার প্রবণতাও খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। কারখানার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয়ে মোটা অংকের অর্থ প্রয়োজন এটি সবাই বোঝে। কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠানে QMS পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতেও যে যথেষ্ট বিনিয়োগ দরকার হয় সেটি অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেন না। একটি প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সম্পদ, মেশিন, জনবল, সবচেয়ে এফিশিয়েন্টলি ব্যবহার করার পদ্ধতি হচ্ছে Quality Management System। বড় প্রতিষ্ঠানের জন্য Quality Management System জাদুর কাঠি। এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন না করে আধুনিক মেশিন বা দক্ষ জনবলের জন্য যত বিনিয়োগই করা হোক না কেন, তা আশাব্যঞ্জক ফল বয়ে আনবে না। এ অমোঘ সত্য যত দ্রুত আমরা উপলব্ধি করতে পারবো, ততই মঙ্গল।

প্রশান্তির নিঃশ্বাস

আব্দুল কাদির হোসেন
অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

লকডাউন আর লকডাউন...

অনেকদিন হয়ে গেলো বাসা থেকে বের হচ্ছি যুদ্ধে যাবার মতো পোশাক পরে। অফিসে, বাজারে যে কোনো জায়গায় যাবার জন্য বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরতে হয়। এরই মধ্যে মনের ভিতরে অনেক তৃষ্ণা হচ্ছিলো যে এখন যদি কোনো একটি খোলা জায়গায় গিয়ে মাস্ক ফেলে দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়া যায়। এইভাবে দিন যাচ্ছিলো তার ভিতরে বিভিন্ন পর্যটন এলাকা খুলে দেয়ার সংবাদ পাচ্ছিলাম। হঠাৎ তিন দিনের ছুটিও পেয়ে গেলাম। আমাদের ম্যানেজারদের কয়েকজন বলল, এই সময় একটু দম ফেলার জন্য ঢাকার বাইরে যাওয়া যায় কি না? সকলের মতামত নিয়ে আমরা একমত হই যে, এখন যেহেতু বর্ষাকাল তাই হাওড় এলাকার দিকে গেলে ভালো হয়। তাই আমরা সবাই সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওড়ে যেতে একমত হই। টাঙ্গুয়ায় যেতে হলে প্রথমেই যেতে হবে শাহ জালালের দেশে, হাসন রাজার দেশে, শাহ আব্দুল করিমের দেশে, রাধারমন দত্তের দেশে, সৈয়দ শাহনূরের দেশে, নদীর ধারে...

বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের সিলেট বিভাগের একটি অঞ্চল সুনামগঞ্জ। উত্তরে খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়, পূর্বে সিলেট, দক্ষিণে হবিগঞ্জ, পশ্চিমে নেত্রকোনা জেলা এবং কিশোরগঞ্জ জেলা। এই জেলায় অনেকগুলো নামকরা নদী রয়েছে যেমন সুরমা, পিয়াইন, যাদুকাটা, খানুয়ারা নদী। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিমুল বাগান সুনামগঞ্জে অবস্থিত। এই সুনামগঞ্জের নামকরণ হয়েছিলো একজন মোগল সিপাহি জনৈক সুনমদির (সুনাম উদ্দিনের আঞ্চলিক নামানুসারে)। এখানে দেখার মতো অনেক জায়গা রয়েছে। আমরা টাঙ্গুয়া যাবার জন্য ঢাকা থেকে রওনা হই রাতে এবং সকালে সিলেট শাহ জালাল (রঃ) এর মাজারে গিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করি তারপর আবার সুনামগঞ্জের দিকে রওয়ানা হই। সুনামগঞ্জে আমাদের জন্য সবকিছু ঠিকঠাক করা ছিলো নৌকা, খাবার, ট্যুর প্ল্যান, কীভাবে যাব, কোথায় যাব? কত সময় থাকব ইত্যাদি।

আমাদের যেন সময় নষ্ট না হয় তাই সুনামগঞ্জে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলো আমাদের

ছোট ভাই রুবেল। প্রথমেই সুনামগঞ্জে গিয়ে সকালের নাস্তাটা সেরে ফেলি। সেখানকার নাস্তা খাই পানসি নামক রেস্টুরেন্টে। এই অঞ্চলে চা এর সুনাম আর বলতে হয় না। তারপরেও বলি, চা টা ছিলো দারুণ। আমরা চা নাস্তা সেরে চলে যাই নৌকা ঘাটে। নৌকা ঘাটে গিয়ে দেখি দারুণ ব্যবস্থাপনা। লাইফ জ্যাকেট থেকে শুরু করে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যাবস্থা করা আছে। আমরা নৌকায় উঠি সুনামগঞ্জের বুলুর মাঠ নামক জায়গা থেকে। বর্তমান এখানের নাম হচ্ছে রিভার ভিউ। জায়গাটি দেখতে দারুণ। আমরা নৌকা নিয়ে রওয়ানা দিলাম, হাসন রাজার বাড়ির ঘাটের দিক থেকে আরো পূর্বে যেতে লাগলাম। নৌকা চলছে হাওড়ের ভিতরে। হাওরের পানিতে বেশ ঢেউ তাই নৌকার দুলুনিতে একটু ভয়ও লাগছিলো। সামনে কোনোকিছু দেখা যাচ্ছে না। আকাশে কখনো মেঘ আবার কখনো রৌদ্রজ্জ্বল। রোদ আর মেঘের খেলায় ভালোই লাগছিলো। হাওড়ে অনেক ছোট ছোট নৌকা দেখতে পাই। সে সব নৌকায় করে জেলেরা মাছ ধরায় ব্যস্ত। দূর থেকে দেখতে অনেক সুন্দর লাগছিলো।

আমরা সবাই অনেক আনন্দ করছি, বিভিন্ন গান বাজছে। কেউ কেউ সে গানের তালে নাচছে, কেউবা আবার গানের সুরে নিজের ঠোঁট নাড়াচ্ছে। গানের লয়ে কেউবা হারিয়ে যাচ্ছে আপন কোনো অতীতের পানে। সত্যি কথা বলতে আমার ছবি তোলার নেশা প্রচুর। তাই কোথাও ঘুরতে গেলে আমার শখের ক্যামেরা নিতে ভুল করি না। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আমি তুলে নিলাম আমার ক্যামেরা। ক্যামেরার লেন্স দিয়ে তুলে আনছিলাম সাদা কালো মেঘের প্রতিবিম্ব, মেঘের আড়ালে সূর্যের উঁকি। এর মধ্যে আমাদের নৌকা এগিয়ে চলছিলো হাওড়ের বুক চিড়ে। আমার সহকর্মীরা উপভোগ করছিলো হাওড়ের সৌন্দর্য আর আমি ক্যামেরা দিয়ে তুলে আনছিলাম হাওড়ের নৌকা, মাছ ধরতে থাকা ব্যস্ত জেলেদের। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যাচ্ছিলো– সাদা বক, পানকৌড়ি, হাওড়ের পানির ঢেউ ইত্যাদি।

নদী থেকে মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো জেলেরা, আমরা তাদের নিকট থেকে তাজা মাছ কিনে রাখলাম সকাল, দুপুর, রাতে খাবার জন্য। ঢেউয়ের তালে তালে নৌকা দুলছিলো, সেই দুলুনির তালে তালে আমরাও দুলছিলাম। দুলতে দুলতে আর আনন্দ-মজা মাস্তিতে, সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপর, তখন আমরা পৌঁছে গেলাম হাওর এলাকার অত্যন্ত মনোরম একটি স্থানে, যেখানে পানির মধ্যে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য হিজল গাছ। দেখতে এতটাই সুন্দর আর মনোরম যে আমি চোখের পলক ফেলতে পারছিলাম না। নীল পানির মধ্যে গাছের পাতাগুলো ঝলমল করছিলো। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন পানির মধ্যে গাছের মেলা। সেখানে অবশ্য আমাদের মতো আরো অনেক পর্যটক এসেছে। এখানকার বেশির ভাগ পর্যটকই পানিতে নেমে বেশ আনন্দ উল্লাসের সাথে গোসল করছে। এখানের পানির গভীরতা বেশি নয়, মাত্র ৪-৫ ফুট এর মতো তাই সবাই এখানে নেমে গোসল করে, সাঁতার পারলেও না পারলেও। এখানে কিছু খুঁদে প্রতিভা পাওয়া যায়, এদের কেউ কেউ গান শোনায় কেউবা দারুণ দারুণ ছবি তুলে দেয়। আবার এসব ছোট ছোট বাচ্চারা নৌকা নিয়ে

আসে পর্যটকদের গোসলে সাহায্য করার জন্য। বিনিময়ে কিছু টাকা উপার্জন করে।

এখানে একটি ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে। টাওয়ারটি অনেক বড়। পানির মধ্যে ওয়াচ টাওয়ারের উপর থেকে দেখলে মনে হয় আমি যেন সাগরের মাঝে দাঁড়িয়ে আছি। সে এক অন্য রকম অনুভূতি। যা বলে বোঝানো যাবে না। সব থেকে অসাধারণ অনুভূতি জাগে গোধূলি লগনে। কারণ চোখের সামনে লাল সূর্যটা টুপ করে পানির ভিতরে ডুবে যায়। যা দেখতে অসাধারণ লাগে।

গোসল সেরে আমরা রওয়ানা দিলাম পরবর্তী স্থান যার নাম নীলাদ্রি। সেখানে গিয়ে দেখতে পাই সে এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য। পাথর আর পাথর কাটা নীল পানি, সবুজ পাহাড়, বিকেলের ঝলমল রৌদ্র। এই সময় এতটাই সুন্দর যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। স্রষ্টার এই সৃষ্টির মিষ্টতা দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো।

আমাদের রাত্রিটা এখানে কাটানোর কথা। তাই রাত হয়ে যাবার পরে আমাদের নৌকাটা হাওরের পাড় থেকে একটু দূরে হাওরের বেশ খানিকটা ভিতরে নোঙর করা হলো। নৌকা থেকে রাতের বেলা অন্য রকম আবহ তৈরি করে। হাওড়ের পাড়ের লাল, নীল বাতিগুলো দেখে মনে হয় হাওড়ের পাড়ে একটি শহর। সে শহরের আলোগুলো হাওড়ের পানিতে ভাসছে। সেদিন ছিলো ভরা পূর্ণিমার রাত, হাওড়ের পানির ঢেউয়ের সাথে রুপালি চাঁদ ভাসছে। কী অপরূপ মায়াময় মোহনীয় রূপ, যা এক কথায় বলে বোঝানো সম্ভব নয়।

টাঙ্গুয়ার হাওড়ে গেলে এক রাত না থাকলে অনেক কিছু মিস হয়ে যাবে। পরের দিন সকালে আমরা রওয়ানা দিই সেই যাদুকাটা নদী, শিমুল বাগান, বারেক টিলা এর উদ্দেশে। যাবার পথে সকালের নাস্তাটা সেরে ফেলি। আমাদের যেতে হবে গ্রামের ভিতর দিয়ে। গ্রামের ভিতরে বিভিন্ন খাল, নদীর বাঁক, ছোট বড় নান্দনিক সব ঘরবাড়ি। সবকিছু পিছনে ফেলে আর গ্রাম্য সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে মন ভরে গেল। আমরা প্রায় দুপুরের কিছু আগেই পৌঁছাই, যাদুকাটা নদী হয়ে শিমুল বাগানে পৌঁছে গেলাম। বর্ষাকালে শিমুল বাগানের রূপে মুগ্ধ সবাই। কারণ চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ, থরে থরে সাজানো সবুজের বাহার। যদিও শীতকালে শিমুল বাগানের রূপ হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে সময় স্বর্গীয় এক রূপের আবহ সৃষ্টি হয়। শীতের সময় শিমুলের বাগানে ফোটে লাল ফুল। তখন থরে বিথরে সাজানো থাকে আকাশ বাতাস শুধু শিমুল ফুলে। যদিও শীতের শিমুল বাগানের সেই সৌন্দর্যটা আমরা পাইনি এই বর্ষায় তারপরও বিধাতা আমাদের নিরাশ করেনি। কারণ আমরা নানা জাতের পাখি দেখেছি সেই সাথে ক্যামেরা দিয়ে ছবিও তুলেছি অসংখ্য। আমার অন্যান্য সহকর্মীরা এখানে বেশ আনন্দে সময় কাটিয়েছে।

শিমুল বাগানের পাশেই বারেক টিলা। নৌকায় করে যেতে হয় সেখানে। বারেক টিলার ঘাটে

নেমে একটু সময় হেঁটে পৌঁছে গেলাম বারেক টিলার ওপরে। পাহাড়ের ওপর হতে দেখা যায় পাহাড়ি ঝর্ণা, নদীর স্রোত, আকাশের সাদা কালো ভাসমান মেঘ। পাখির ওড়াউড়ি, সবুজের মাতোয়ারা রূপ। মনের অজান্তে গেয়ে উঠলাম-
"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি;
সকল দেশের রানি, সে যে আমার জন্মভূমি।"

এখানে নেই কোনো কোলাহল, নেই কোনো আতঙ্ক, নেই কোনো মাস্ক, নিজেকে নিজে বিলিয়ে দিলাম প্রকৃতির মাঝে। আমরা সবাই যার যার মতো সময় কাটালাম এখানে, কেউ ছবি তুললো, কেউ প্রকৃতির মাঝে নিজেকে সপে দিলো, কেউ ঝর্ণার শীতল পানিতে নিজের দেহকে ভিজালো, আমি কারো কারো ছবি ক্যামেরা দিয়ে বন্দি করে রাখলাম। সেই সাথে মনে হলো দীর্ঘদিন পরে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, প্রশান্তির নিঃশ্বাস।

ভাড়াটিয়াদের সাতকাহন

উম্মে সালমা ডালিয়া
সিনিয়র ম্যানেজার, প্যাটার্ন
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

বর্তমানে সারা বিশ্ব কোভিড বিষে নীল হয়ে আছে, দুই একটা সেক্টর বাদ দিয়ে বাকি সব সেক্টর স্থবির হয়ে গেছে। পোশাক শিল্প, ট্যুরিজম, রেস্টুরেন্ট ব্যবসা, আবাসন শিল্প, ট্রান্সপোর্ট, শিক্ষাখাত, কৃষি সব জায়গায় ধ্বস নেমেছে। সারা বিশ্বের অগণিত মানুষ বেকার হয়ে পড়েছে। অনেকে এই হঠাৎ বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ আত্মহত্যার মাধ্যমে জ্বালা জুড়িয়েছে। সবচেয়ে বিপদে পড়েছে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা। এরা না পারছে কিছু করতে, না পারছে কারো কাছে হাত পাততে। আর এই কঠিন পরিস্থিতিতে ঢাকার কিছু সংখ্যক বাড়িওয়ালা তাদের ভাড়াটিয়াদের সাথে করেছেন চরম অমানবিক ব্যবহার, যা আমরা প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়ার কল্যাণে কম বেশি সবাই জানি। এই পরিস্থিতিতে কর্মহীন মানুষেরা ঢাকা ছাড়ছেন দ্রুতগতিতে। সপ্তাহ দুয়েক আগে একটা প্রতিবেদনে দেখলাম কুরবানির ইদের আগে ঢাকা ছেড়েছে প্রায় এক লক্ষ পরিবার। এ ছাড়াও ইদের সময় আরও পঞ্চাশ হাজার পরিবার ঢাকা ছাড়বেন বলে রিপোর্টে উঠে এসেছে। আমি ভাবছি এখন ঐ সব বাড়িওয়ালাদের কী হবে? ইতোমধ্যেই অলিতে গলিতে শুধু টু-লেট দেখা যাচ্ছে। বাড়ি খালি কিন্তু ভাড়াটিয়া নেই। আমার এক পরিচিতার মায়ের ঢাকায় দুটো পাঁচ তলা বাড়ি। প্রতিটি ফ্লোরে দুটো ইউনিট, ভাড়া দিয়েই তারা খরচ নির্বাহ করেন। বর্তমানে মাত্র দুটো ফ্ল্যাটে ভাড়াটিয়া আছে। আর সবাই বাসা ছেড়ে চলে গেছে। ভাবুন একবার অবস্থাটা, যারা কি না ভাড়া দিয়েই চলেন, সেই ভাড়াটিয়া-ই যদি না থাকে তাহলে দুইটা বাড়ি বা পাঁচটা বাড়ি থেকে কী লাভ হলো? অথচ এদের প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হলে এরা বাসা ছেড়ে চলে যেত না।

ঢাকায় ভাড়াটিয়াদের বলা হয় ভাড়াইট্টা। ভাড়াটিয়া শব্দটার মধ্যেই কেমন যেন একটা অসম্মান লুকিয়ে আছে বলে আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আমার জন্ম হয়েছিলো সরকারি বাসাতে। আমার শৈশব, কৈশোর কেটেছে সরকারি কোয়ার্টারে। তখনও ভাড়াটিয়া শব্দটার

সাথে তেমনভাবে পরিচয় ঘটেনি আমার। এরপর আমরা যখন সরকারি বাসা ছেড়ে ভাড়া বাসায় উঠলাম, তখন পদে পদে অনুভব করতে লাগলাম ভাড়াটিয়া হওয়ার কষ্ট। আমার আব্বা তখনও স্থায়ী বাড়ি করার কথা ভাবেননি। এ ছাড়া তাঁর একার রোজগারে এত বড় একটা পরিবারের খরচ বহন করে বাড়ি করার মতো সামর্থ্যও ছিলো না। বরিশালে আমরা যে সব বাসায় ভাড়া থেকেছি সেখানকার বাড়িওয়ালা এখনকার বাড়িওয়ালাদের মতো এত খারাপ ছিলো না। তবে বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়াদের মাঝে যে একটা অদৃশ্য দেয়াল আছে সেটা বুঝিয়ে দিতেন। এক পর্যায়ে আমরা ঢাকায় চলে আসি। এখানে বাড়ি ভাড়া নিতে গিয়ে আমার ব্যাপক অভিজ্ঞতা হয়েছে। ১৯৯২ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত অনেক বাসায় ভাড়া থেকেছি। ঢাকা শহরের বেশির ভাগ বাড়িওয়ালারা ভাড়াটিয়াদের কোনো সম্মান দিতে রাজি নয়। একবার রূপনগর আবাসিক এলাকায় টু-লেট দেখে বাসা খুঁজতে গিয়েছি, কলিংবেলের আওয়াজে এক ভদ্র মহিলা নেমে এলেন। আমি বিনীতভাবে বাসার ভাড়া কত, কয় রুম ইত্যাদি জানতে চাইলে উনি বললেন, আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কয়জন। উত্তরে আমি বললাম– আমি, আমার হাজব্যান্ড, ছেলে, আমার শ্বশুর/ শাশুড়ি এবং দুই দেবর। এটা শুনেই উনি বললেন– না, আমরা ছোট পরিবার চাচ্ছি, তিন জনের বেশি নয়। আমি রাগে দুঃখে বলেছিলাম দয়া করে টু-লেটের নিচে "এতিমদের ভাড়া দেওয়া হবে" কথাটা লিখে দিবেন। কারণ এতিমদের বাবা-মা থাকে না।

মোহাম্মদপুরে এক ডাক্তারের বাসায় ভাড়া ছিলাম। সেই বাসার বাড়িওয়ালি আমাদের বাসায় এসে জুতো স্যান্ডেল গুনে দেখতো লোক বেশি আছে কি না। বাথরুমে ঢুকে দেখতো পানি ধরে রেখেছি কি না। এমনকি মেইন গেটের চাবি আমাদেরকে দিত না, কেউ এলে উনাকে জানাতে হতো, তারপর উনি চাবি দিতেন। রেগুলার সদস্য হলে কোন কথা বলতেন না, কিন্তু মেহমান এলে রাগ করতেন। কি যে এক মানসিক পীড়া দিত ওই মহিলা যা এখনও মনে হলে খুব কষ্ট হয়। এক বছর ছিলাম ওই বাসায়। এতক্ষণ বললাম কিছু খারাপ বাড়িওয়ালাদের কথা। আমি বলছি না সব বাড়িওয়ালা-ই খারাপ। তবে খারাপের পাল্লাটাই ভারি বেশি। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে কিছু ভালো মানুষও পেয়েছিলাম বাড়িওয়ালা হিসেবে। ১৯৯৮ সালে আমার দেবরের ব্রেন টিউমার চিকিৎসার জন্য ভারতের ভেলোরে আমার হাজব্যান্ড তার ভাইকে নিয়ে দুই মাসের জন্য চলে গিয়েছিলেন। তখন আমরা থাকতাম মিরপুর ৬নং সেকশনে, প্রশিকা বিল্ডিং এর বিপরীত গলিতে। ঐ বাড়িওয়ালা ছিলেন অত্যন্ত স্বজ্জন ব্যক্তি। উনি দুই মাসের ভাড়াতো নেননিই উপরন্তু আমাকে বাজার করে পাঠাতেন। দেখা হলেই জিজ্ঞেস করতেন কোনো সমস্যা আছে কি না। শ্যামলীতে এক কর্নেল সাহেবের বাসায় থাকতাম উনিও বেশ ভালো ছিলেন। ঠিক বাড়িওয়ালাদের মতো আচরণ করতেন না। আমার খুব ইচ্ছা ছিলো আল্লাহ যদি কোনো একদিন আমাকে বাড়িওয়ালা বানিয়ে দেন, তাহলে আমি দেখিয়ে দেব বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়ার সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিৎ। কিন্তু বোধ করি এই স্বপ্ন এ জীবনে পূরণ হবার নয়।

করোনা পৃথিবীর অনেক ক্ষতি করেছে, যা ঠিক হতে আগামী কত বছর যে লাগবে তা কেউ বলতে পারছে না। আদৌ ঠিক হবে কি না সেটাও জানি না। কিছু বিষয় আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেলো। যেমন– বন্ধু চেনা গেলো, আত্মীয় চেনা গেলো, এমন কী একান্ত আপনজনকেও চেনা গেলো। ছোট বেলায় জেনেছি কেয়ামতের ময়দানে কেউ কাউকে চিনবে না, মা/ বাবা সন্তানকে, সন্তান বাবা/ মাকে চিনবে না। সবাই ইয়া নাফ্সি, ইয়া নাফ্সি বলতে থাকবে। করোনার কল্যাণে কেয়ামত পর্যন্ত যেতে হয়নি পৃথিবীর মানুষকে। আল্লাহ আমাদের দেখিয়ে দিলেন আমরা কতটা মানবিক এবং কতটা ভয়ঙ্কর। আসুন আমরা সবাই আল্লাাহর কাছে প্রার্থনা করি, যেন অতি দ্রুত আমাদের সবকিছু ঠিক করে দেন। আমিন।

কোভিড-১৯ এবং আমাদের পোশাকশিল্প

এম এম তোফাজ্জল হোসেন
অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

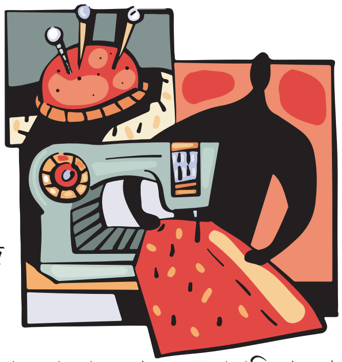

‘আপনারা কেন বুঝতে পারছেন না, আমাদের সকল অর্ডার বাতিল হয়ে যাচ্ছে। সামনে ইদ, শ্রমিকদের বেতন দিতে হবে, বোনাস দিতে হবে, আমরা কবে নাগাদ নতুন অর্ডার পাবো জানি না, প্লিজ আপনারা বুঝার চেষ্টা করুন।’

ঘড়িতে সন্ধ্যা ছয়টা কী সাতটা, টিভিতে সন্ধ্যার সংবাদ দেখছি। বিজেএমইএ এর সভাপতি ডঃ রুবানা হক’কে একজন সাংবাদিক যখন প্রশ্নজালে জর্জরিত করছেন তখন জবাবে এভাবেই উত্তর দিচ্ছিলেন তিনি। বলছিলাম বাংলাদেশে এবং সারাবিশ্বে যখন Covid-19 pandemic নিয়ে দহরম মহরম চলছে সেই সময়কার কথা। সারাদেশে চলছে লকডাউন।

বাংলাদেশে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় চার হাজার পোশাক কারখানা রয়েছে। এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত প্রায় চল্লিশ লাখেরও বেশি জনবল। আর পরোক্ষভাবে প্রায় আড়াই কোটি। বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় পঁচাশি শতাংশ আসে এই খাত থেকে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল ধরনের উন্নয়ন এবং কতগুলো পরিবারের বেঁচে থাকার অবলম্বন হয়ে উঠেছে এই পোশাক খাত। কর্মীবান্ধব এই শিল্পটি তার সাথে জড়িত মানুষগুলোকে সম্পদে পরিনত করেছে। এখানকার একেকজন মানুষ এক একটি সম্পদ, বিশালাকার কর্মী বাহিনীকে সাথে নিয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে এই শিল্প। যেই মানুষগুলোকে একসময় মনে করা হতো বোঝা তারাই এখন মানবসম্পদ।

বিশাল এই জনবল সম্পন্ন এই খাতেই সবচাইতে বেশি দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু তা হয় না কখনোই, বরঞ্চ এই সেক্টরের যে কোন ছোট বড় বিষয়গুলো আমাদের তথাকথিত হলুদ মিডিয়া, দেশি বিদেশি সংবাদ মাধ্যম আর টকশো বোদ্ধারা এতবেশি রসবোধ দিয়ে নেতিবাচকভাবে ফুটিয়ে তুলে যে বাহির থেকে দেখলে মনে হতেই পারে শিল্পটি দেশের সম্পদ নয়, অভিশাপ। যার ফলশ্রুতিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই শিল্পের ক্ষতি ছাড়া ভালো কিছু হচ্ছে না। ফলে এর সাথে জড়িতদের সবসময় থাকতে হয় একটা মানসিক

চাপে, ভুগতে হয় আত্মবিষাদে।

Covid-19 যখন সারাবিশ্বে মহামারি আকার ধারণ করে তার আপন গতিতে ধাববান, তখন সব চাইতে বেশি হুমকির মুখে পড়েছে পোশাক শিল্প। ইউরোপিয়ান দাতা গোষ্ঠীর বেশ বড় বড় কিছু ক্রেতা আমাদের সাথে ব্যবসা করতে নিরুৎসাহিত হতে লাগলো, একের পর এক বাতিল হতে লাগলো ক্রয়াদেশ। আর পূর্বেই যে সব ক্রয়াদেশ ছিলো সেগুলোর ও প্রস্তুতকৃত পন্য জাহাজীকরণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

এমন একটি অবস্থায় পোশাক শিল্প মালিকরা সর্বোচ্চ ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন। পরিস্থিতির কাছে অসহায় হলেও মাথা নত করেননি, মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিলেন, আজও দিচ্ছেন। হাতে গোনা কয়েকটি ফ্যাক্টরি ছাড়া বেশিরভাগ পোশাক শ্রমিকরাই ঘরে বসে বেতন পেয়েছে, এই জন্য সরকারের প্রনোদনার বাইরেও মালিকরা নিজেদের সঞ্চিত সম্পদ থেকে শ্রমিক এবং কর্মচারীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। যেখানে প্রতিদিন বিভিন্ন সেক্টর থেকে কর্মী ছাঁটাইয়ের মতো ঘটনা ঘটেছে সেখানে এই সেক্টরের কোনো ফ্যাক্টরি থেকেই সেভাবে কোনো কর্মী ছাঁটাই হয়নি।।

প্রতিদিন ক্রয়াদেশ বাতিলের ঘটনা ঘটছে, এমন অবস্থায় শিল্প মালিকগণ শ্রমিকদের পক্ষে-বিপক্ষে তাৎক্ষণিক কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আসলে এমন পরিস্থিতিতে শতভাগ সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়াটা মামুলি ব্যাপার ছিলো না। আর সে কারণেই অনেক বেশি সমালোচনার সম্মুখিনও হতে হয়েছে। দেশীয় অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান অগ্রগতিতে সব চাইতে বেশি অবদান রাখা এই শিল্পকে বারবার নেতিবাচক কটুক্তি আর কথিত সমালোচকদের রক্তচক্ষু দেখতে হয়েছে। শতবার আঙুল তুলেছে আমাদের দিকে। তবুও আমরা ভেঙে পড়িনি।

Covid-19 এর কারণে ক্রয়াদেশ বাতিল এবং নতুন করে ক্রয়াদেশ না হওয়ায় প্রায় সকল ফ্যাক্টরি উৎপাদন সক্ষমতার চেয়ে অর্ধেক উৎপাদন করছে। সেক্ষেত্রে জনশক্তি ছাঁটাই অথবা বেকার হবার কথা অর্ধেক অথবা শতকরা হিসেবে পঞ্চাশ শতাংশ। কিন্তু শুধুমাত্র কর্মীবান্ধব শিল্প মালিকদের উদার মানসিকতা আর মানবিকতার কারণে তেমন কোনো কর্মী ছাঁটাই-ই হয়নি এই খাতে। তারপরেও যত দোষ এই শিল্পের। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারি Covid-19 এর কারণে পোশাক কারখানাগুলোতে ছাঁটাই অথবা বেকার হয়েছে মাত্র সাড়ে ছয় থেকে সাড়ে সাত শতাংশ, যা নিঃসন্দেহে খুবই সীমিত।

করোনাকালীন সময়ে ফ্যাক্টরিগুলো খোলা রেখে কাজ করানোর জন্য বারবার জবাবদিহিতার রোষাণলে পুড়তে হয়েছে। পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়েও হয়েছিলো নানা দোদুল্যমনতা। শিল্প শ্রমিকদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়ে মালিকরা নিজেদের আখের গোছাতে চাইছেন, এমন কটুবাক্যও ব্যয় হয়েছে শিল্পমালিকদের উদ্দেশে। অথচ কর্মস্থলে গেইটে

প্রবেশ করা থেকে শুরু করে বের হওয়া পর্যন্ত সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য নিরাপত্তা পাচ্ছে শ্রমিক কর্মীগণ। দিনের কয়েকটি সময়ে হাত ধোয়ানো, শরীরের তাপমাত্রা মাপা, সামাজিক দূরত্ব রেখে কাজ করা, সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ... কি না করা হচ্ছে! এই মহামারির সময়ে একটা বিষয় ভীষণভাবে লক্ষণীয় হচ্ছে, শ্রমঘন এই শিল্পে শুধুমাত্র মালিক এবং কর্তা ব্যক্তিদের কঠোর পর্যবেক্ষণ এবং শ্রমিকদের প্রতি অনেক বেশি সচেতনতার ফলে এই শিল্পে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা এবং মৃতের সংখ্যা একেবারেই হাতে গোনা। পথ চলার শুরু থেকে যতবারই পোশাক শিল্পে কোনো সমস্যা হয়েছে অথবা অন্য কোথাও কোনো সমস্যা হলেই সবার আগে পোশাকশিল্পের দিকেই আঙ্গুল তোলা হয়। হোক সে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা কোনো মহামারি। তিলকে তাল বানিয়ে রসবোধ নিয়ে আলোচনার টেবিলে রসালো আলোচনা হয়। যে দেশের অর্থনীতির শক্ত মেরুদণ্ড গঠনে প্রতিনিয়ত অবদান রাখছে তৈরি পোশাক শিল্প, সেখানে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হতে হয় এই শিল্পটিকে।

বাংলাদেশে যখন রানা প্লাজা দুর্ঘটনা ঘটলো তখন এই শিল্পের সুনাম প্রায় তলানীতে পৌঁছে যাবার উপক্রম হয়েছিলো। তখনও বিভিন্ন ক্রেতা রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের সাথে তাদের ব্যবসায়িক সর্ম্পক ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলো। শ্রমিকদের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে মালিকদের চাপের মুখে রাখতে লাগলো। Accord, Alliance এর আগমন হলো বাংলাদেশে। শুধুমাত্র শ্রমিকদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে বিল্ডিং সেইফটি থেকে শুরু করে অগ্নি প্রতিরোধক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন শিল্প মালিকরা। কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ করতে দ্বিতীয়বার ভাবেননি তারা। এই রকম উদার মানসিকতা শুধুমাত্র এই শিল্পের মালিকরাই দেখিয়েছেন। এতটা চাপের মুখে মালিকদের কাছ থেকে কাজ আদায় করিয়ে নিয়েছেন ক্রেতা রাস্ট্রগুলো, কিন্তু সেই তুলনায় না বেড়েছে ক্রয়াদেশ, না বেড়েছে মূল্য, বরং মূল্য কমেছে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ শতাংশ।

সরকারি-বেসরকারি বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিনিয়তই হিমশিম খাচ্ছে পরিস্থিতি সামাল দিতে। ব্যাংক, বীমা , হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ সব জায়গায় ব্যবসা হচ্ছে। সেসব জায়গায় ও নানা ধরনের সমস্যা হয়, কিন্তু সেগুলো মিডিয়াতে আসে না, আলোচনা হয় না কোনোদিনও। আলোচনার তীরটি প্রতিবার এই দিকেই তাক করা থাকে।

কিন্তু তাতে কী? ঐ যে কথায় আছে না 'নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো।'

আমি মনে করি বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের বর্তমান অবস্থা বেশিদিন থাকবে না। ইতোমধ্যেই সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। তৈরি পোশাক শিল্পে বসন্তের আগমণী বার্তা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে আমরা পেরেছি। কে কী বললো, কী ভাবলো তা নিয়ে ভাববার সময় আমাদের নেই। এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হবে আমাদেরই। অন্যথায় সোনালি আঁশের মতো এই শিল্পটিও মুখ থুবড়ে পড়বে।

ডঃ রুবানা হক সেইদিন ঐ সাংবাদিককে খুব অসহায়ভাবে বলছিলেন 'প্লিজ দেশের এই পরিস্থিতিতে আমরা সবাই হতবাক। এই সমস্যা শুধু আমাদের একার নয়, পুরো বিশ্ব এই পরিস্থিতির শিকার। অতএব, কার দোষ, কার ভুল, সেসব নিয়ে নিজেদের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুড়ি না করে সবাইকে একত্রে সমাধান করতে হবে।'

ঠিক তাই– তৈরি পোশাক শিল্পকে আপন মহিমায় টিকিয়ে রাখতে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। এই শিল্পকে মেরুদণ্ডহীন হতে দেয়া যাবে না। শত প্রতিকূলতাকে জয় করে আপন মহিমায় মাথা উঁচু করে ছিলো, থাকবে। আমরা আশায় বাঁচি আর আশার আলো উঁকি দেয়া শুরু করেছে তৈরি পোশাক খাতে।

করোনা সন্দেহ

মো. আনারুল ইসলাম
সুপারভাইজার, রক্ষণাবেক্ষণ
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

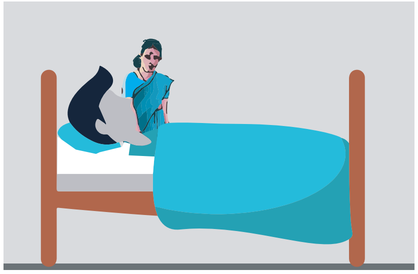

সকালবেলা হঠাৎ করে হাঁচি দিলাম যখন
পাশে থেকে বউটা ভয়ে লাফিয়ে উঠল তখন
দুপুরবেলা হঠাৎ করে গায়ে এলো জ্বর
বন্ধুরা সব চিৎকার করে বললো এখন সর।

মাথাব্যথা নিয়ে যখন চলে আসলাম বাড়ি
বউটা দেখি বাচ্চা নিয়ে চলছে বাবার বাড়ি
বললাম তারে কোথায় গো যাও,
কথা বলে না
করোনাতে ধরছে তোমায় তাও কি বুঝ না।

সন্ধ্যাবেলা গলাব্যথায় ভয় পেয়ে যাই আমি
মনে হলো সত্যি আমি করোনার আসামি,
ডাক্তার যখন রক্ত নিলো
পুলিশ আসলো তখন
লাল ফিতা সব বেঁধে দিলো,
বাড়ি লকডাউন।

দূরে গেল আশেপাশের আপন যারা ছিলো
করোনা ভাইরাস এখন আমায় মানুষ চিনালো,
বাড়িতে শুধু মা রয়েছে, সবাই গেছে চলে
মাঝে মাঝে কিছু মানুষ মোবাইলে কথা বলে।

মহাবিপদে পাশে শুধু পড়ে রইলো মা
তাইতো বলি মাগো তোমার নেইকো তুলনা,
আস্তে আস্তে জ্বর তো গেলই, গেলো সর্দি কাশি
এখন আমি ভালোই আছি নেইতো কোনো হাঁচি।

হাসতে হাসতে বউটা এসে কামড় দিয়ে জিভ
বললো আমায় দেখো তোমার রিপোর্ট নেগেটিভ
শুধু শুধু কষ্ট দিলাম ক্ষমা করো মোরে
শত বিপদেও আমি কভু যাব না তোমায় ছেড়ে।

করোনা তুমি শিখিয়ে দিলে কে আপন, কে পর
মায়ের চাইতে কেহ নয়তো আপন
বাকি সবাই পর।

প্রেমের মহাকাব্য

সৈয়দ মাহাবুব মোর্শেদ
অফিসার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

আমিতো প্রেমের কাব্য রচনা করিনি
তাই বলে কি আমি প্রেমের সাগর দেখিনি?
সাগরের তর্জন গর্জন আমি শুনেছি
শূন্য হাতে মাঝিকে আমি ফিরে আসতে দেখেছি।

আমি সূর্য অস্ত যেতে দেখেছি
সাঁঝের বেলায় প্রেমের মায়ায়
মুখ লুকিয়ে আমি অট্টহাসি হেসেছি
লজ্জাবতি পাতার মতো লজ্জাও পেয়েছি।

জোছনা রাতের মিটিমিটি তারায় আমি অতীত খুঁজেছি
দুঃসহ স্মৃতিগুলো রোমন্থন করেছি
সকালবেলার ঘন কুয়াশায় মুখ লুকিয়ে
আমি প্রেতাত্মাকে গান শুনিয়েছি।

কবে কাটবে ঐ অন্ধকার
আসবে সুদিন ফিরে বারে বার
তবে কি প্রেমের মহাকাব্যের আড়ালে
সৃষ্টি হবে নতুন এক ইতিহাস!

তোমার অপেক্ষায় আছি

মোছা. হালিমা খাতুন
সহকারী অপারেটর, সুইং সেকশন
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

কত অপেক্ষায় আছি তোমার লাগি
ভাবছি তোমায় সারারাত জাগি
তুমি কী একবারও ভেবেছো আমায়?
যদি তুমি ভাবতে আমার কথা
দিতে না আর প্রাণে ব্যথা।

কাঁদাতে না আর তুমি আমায়
আর পোড়াতে না তোমার প্রেমের অনলে
দুঃখও দিতে না আর আমায় তুমি
জ্বালাতে না আর তোমার রূপে
তুমি যদি ভালোবাসতে আমায়
তবে তোমার করে নিতে আমায়

জানি তুমি ভালোবাসো না আমায়
তাইতো শুধু কাঁদাও আমায়
দুঃখ দাও পোড়া হৃদয়ে
যতই দুঃখ দাও তুমি আমায়
ততই আমার করে নিবো তোমায়

যতই কষ্ট পাই আমার এই পোড়া হৃদয়ে
ততই আমি ভালোবাসবো তোমায়।
এখন ফিরে এসো ভালোবাসা আমার
তোমার জন্য আছি অপেক্ষায়।

মা

মোছা. বিউটি খাতুন
মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন প্রিন্টার্স লিমিটেড

মা কথাটি বড়ই মধুর
শুনতে লাগে ভালো
মায়ের মাধ্যমে দেখেছি মোরা
এই পৃথিবীর আলো।

দশ মাস দশ দিন তুমি
গর্ভে দিয়েছ ঠাঁই
মাগো তোমার সাথে তাই
তুলনা যে কারো নাই।

মা তুমি স্বর্গ আমার
তুমি যে মহান
তোমার পদতলে আছে
জান্নাত আমার

সবশেষে আমি
পৃথিবীর সকল মা কে
জানাই সালাম
সত্যি মা তুমি যে
চির মহিয়ান।

স্বপ্ন বিভোরে তুমি

শাহানাজ পারভীন
সহকারী সুপারভাইজার, সুইং সেকশন
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

হাতে হাত রেখে হাঁটছি দুজনে
সমুদ্র তীর ধরে
কখনোবা ভাসছি দুজনে
অথৈ সাগর জলে।
কখনোবা রয়েছি বসে স্বপ্ন রোদ্দুরে।
তোমার কোলে রেখে মাথা
মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখি– সকলি স্বপ্ন

বুকজুড়ে নামে কেবল শূন্যতা।
যেই তুমি ছিলে কত না দূরে
সেই তুমি আজ কত যে কাছে
রয়েছি দুজনে পাশাপাশি
সব অভিমান ভুলে নাও কাছে টেনে
আমিও নির্ভয়ে কাছে আসি
হাতে রেখে হাত বলো অবশেষে
তোমার ছিলাম আমি, তোমারি আছি
কোনোদিন হবো না পর
মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখি– সকলি স্বপ্ন
সত্যি নয় কোনোকিছু।

আমি জানি– বাস্তব বড় কঠিন, বড় নির্মম!
তোমাকে নিয়ে দেখা স্বপ্ন সত্যি হবে না
তবুও এ মন স্বপ্ন দেখে
স্বপ্ন বিভোরে তোমায় কাছে ডাকে
আঁকে তোমায় নিয়ে ভালোবাসার আল্পনা

বাপের কাছে ছেলের চিঠি

মো. খোরশেদ আলম
প্রাক্তন কাটিং সহকারী, কাটিং সেকশন
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

শ্রদ্ধেয় বাপ
পড়ার খুব চাপ,
ফুরিয়ে গেছে টাকা
কেমনে থাকি ঢাকা।

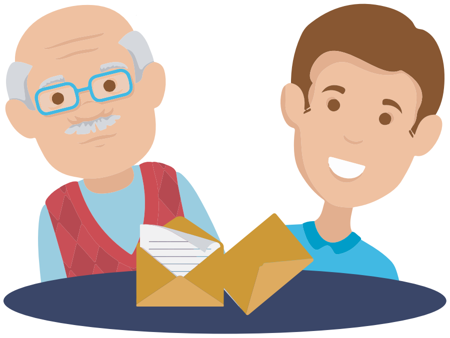

আমার সালাম নিও
পাঁচশ টাকা দিও,
জলদি টাকা চাই
ইতি তোমার কানাই।

(বাপের উত্তর)

বাছাধন কানাই
সত্য কথা জানাই,
পকেট এখন ফাঁকা
কোথায় পাবো টাকা।

দিন যে কাটে নারে
থাকছি অনাহারে,
টাকার খুব অভাব
ইতি তোর বাপ।

করোনা সংক্রমণ

নীলা খাতুন
কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি কন্ট্রোল
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

বিশ্বের অধিকাংশ দেশগুলোয় হানা দিয়ে
আজ বাংলায় হানা দিয়েছে প্রাণঘাতক করোনা,
বসন্তের বাতাসে নিঃশব্দে উঁকি দিয়ে ডাকছে নোভেল করোনা
তাইতো বাংলাদেশের মানুষ সতর্ক থাকতে ভুলো না।

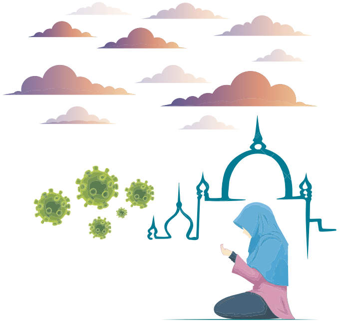

হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মাঝখানে
শত শত বন্যা বাঁধা পড়ে থাকে,
তেমনি সৃষ্টিকূলের সাধ্যের বাহিরে বাসা বেঁধেছে করোনা
হোম কোয়ারেন্টিন আর লকডাউন কতদিন চলবে

কখন কবে যে, এই মরণ সংক্রমণ ভাইরাস বিদায় নিবে
ধৈর্য্যের মাধ্যমে সচেতন ভিত্তিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ভুলো না
কোরআন তেলওয়াত রোজা নামাজ আদায়
আল্লাহর শুকর গুজার করতে কখনও দ্বিধা করো না।

জন্মদাত্রী মা

মো. রেজুওয়ানুল হক রাইজু
সহকারী অপারেটর, সুইং সেকশন
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

বিধাতার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এক নারী "মা"
তুমি করেছ আমায় জন্মদান,
বুঝি না কীভাবে সাজাব তোমার প্রশংসা
স্মরণ করে বহুবিধ অবদান।

আমার অসুস্থতায় রাজ জেগে সেবা করেছ
খাবার দিয়েছ মুখে তুলে,
করেছ শাসন-আদর, দিয়েছ শিক্ষা-শান্তি
তোমার হৃদয়খানি খুলে।

তোমার কাছে গচ্ছিত আছে মা
সন্তানের অনেক সুখ,
হজ্জের সওয়াব মিলে সুদৃষ্টিতে দেখলে
একবার তোমার মুখ।

"মা" তুমি এমনই এক উজ্জ্বল সৃষ্টি বিশ্ব ভুবনে,
যখনি দেখি তোমার মুখ, দুঃখ থাকে না মনে।

তোমার লালনে তোমারি গুণে
জীবন হয়েছে আমার ধন্য,
আমি জীবন দিতে পারি মাগো
শুধু তোমারি জন্য।

হতে পারি আমি কবি সাহিত্যিক
জজ-ব্যারিস্টার কিংবা প্রেসিডেন্ট দেশ বরেণ্য
তবুও "মা" আমার কাছে তুমি অতুলনীয়
তোমার তুলনায় আমি নগন্য

দোয়া করো মাগো
হতে চাই তোমার খাঁটি সন্তান
দিতে চায় তোমায় সেবা
আর প্রকৃত সম্মান।

সবুজ আর প্রকৃতির ভালোবাসার কাব্য

আব্দুল্লাহ আল মামুন
অফিসার, একাউন্টস
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

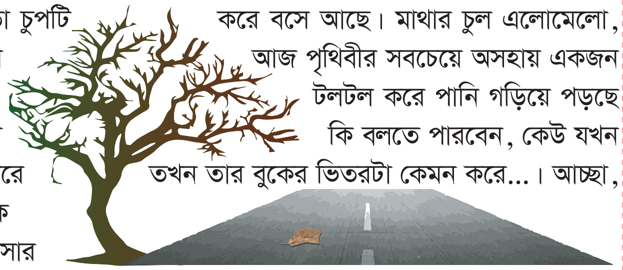

সবুজ আজ অবুঝের মতো চুপটি করে বসে আছে। মাথার চুল এলোমেলো, নির্বাক দৃষ্টি। মনে হয় সে আজ পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায় একজন মানুষ। চোখ ছলছল, টলটল করে পানি গড়িয়ে পড়ছে অনবরত। আচ্ছা, আপনি কি বলতে পারবেন, কেউ যখন খুব বেশি অসহায় বোধ করে তখন তার বুকের ভিতরটা কেমন করে...। আচ্ছা, আপনি কি কখনো কাউকে ভালোবেসেছেন? ভালোবাসার অনুভূতি কি আপনি বুঝতে পারেন? আর যদি এমন হয় ভালোবাসার মানুষ ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনি তাকে কোনোভাবেই বাঁচাতে পারছেন না। তখন আপনার কেমন লাগবে একটু চোখ বন্ধ করে ভাবুন তো। ... এবার চোখ খুলুন, দেখবেন আপনার চোখের কোণে পানি টলমল করছে।

হঠাৎ কাকের কা কা শব্দে সবুজ যেন বাস্তবতায় ফিরে এলো। সে হাঁটছে রাস্তার কোনো একপাশ ধরে একা একা...। কিন্তু কালো পিচঢালা পথ দিয়ে সবুজের হাঁটতে একটুও ভালো লাগছে না। তার মনে পড়ে কোনো এক সময় এই জায়গায় মাটির রাস্তা ছিলো। কী সুন্দর সেই আঁকাবাঁকা আলতা জড়ানো মেঠোপথ... রাস্তার দু'পাশে অবিরাম বয়ে চলতো সবুজ ধানক্ষেতের সমুদ্র। সবুজের বুকটা হাহাকার করে উঠলো। সে আচমকা থমকে দাঁড়ালো, তাঁর খুব বেশি ক্লান্তি অনুভব হচ্ছে কিন্তু বিশ্রাম নিবে কোথায়? কোথাও তো কোনো গাছপালা নেই। সূর্যটাও ঠিক মাথার উপরে দাউ দাউ করে জ্বলছে। সবুজ ক্রমান্বয়ে ঘামছে... একটি গাছ খুঁজে পাবার আশায় সে মাইলের পর মাইল পাড়ি জমায় কিন্তু গাছতো নেই। তার উপায় না পেয়ে পিচ ঢালা কালো রাস্তার কোনো একপাশে বসে পড়লো সে। নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে দূর কোনো অজানায়...। সবুজের মনে পড়লো কোনো এক সময় এ জায়গায় স্বচ্ছ পানির লেক ছিলো। লেকের দু'পাশে অসংখ্য নাম জানা, অজানা সবুজ গাছও ছিলো। পানির কল কল মন মাতানো শব্দ, স্বচ্ছ পানিতে ব্যাঙাচির দূরন্তপনা, মাছ আরো অন্যান্য জলজ প্রাণী ছিলো। আহ! কী অপরূপ শোভা জড়ানো, কী সুন্দর ছিলো এই প্রকৃতি। সবুজ এবার চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলো। সবুজের কান্নায় আকাশ বাতাস সব যেন ভারী হয়ে উঠলো...।

ময়লার স্তুপ থেকে এক ঝাঁক কাক কা.. কা.. করতে করতে উড়ে গেল। কয়েকটি কুকুর যেন

উপহাস করে ঘেউ ঘেউ শব্দে চিৎকার করতে লাগলো। সবুজ আজ হতবাক!

সবুজ আবারো হাঁটতে শুরু করলো একা একা। তার পিছনে যেন যন্ত্রচালিত অসংখ্য দানব মিছিল নিয়ে তাড়া করছে। বিকট শব্দে, শব্দ-দূষণ, ধুলা-বালি আর কালো ধোঁয়ার সংমিশ্রণে পুরো আকাশ যেনো অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। কালবৈশাখী ঝড় আসলে মানুষ যেমন দৌড়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থলে যায়। ঠিক তেমনি সবুজ দৌড়াতে শুরু করলো। ঐ... দূরে সবুজ একটি চায়ের দোকান দেখতে পেলো। সবুজ চায়ের দোকানে বসলো। তার বুকটা ধড়ফড় করছে। গলাটা শুকিয়ে যেন কাঠ। চা দোকানদারকে বললো– চাচা, আমাকে এক গ্লাস পানি দিবেন। চাচা কিছুক্ষণের জন্য সবুজের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, এই নাও পানি। মুখটা একটু ধুয়ে নাও ভালো লাগবে। আজ গরমটাও পড়েছে বেশ। সবুজ মুখটা ধুয়ে, একটু পানি পান করে কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলো। তারপর বললো, চাচা, রং চা হবে। একটু আদা, পুদিনা পাতা আর কালো জিরা মিশিয়ে দিবেন। দোকানদার মুচকি হেসে বললেন আজকাল এই চা কেউ তেমন একটা খায় না। তাই আমার কাছে এই চা হবে না। কিন্তু উন্নতমানের দুধ চা, কফি, ইত্যাদি... ইত্যাদি...।

সবুজের বুকটা যেন তৃষ্ণায় ফেটে যাচ্ছে। সবুজের মনে পড়ে কোনো এক সময় এই জায়গায় কাদা মাটি আর বেড়ার তৈরি একটি চায়ের দোকান ছিলো। মাটির চুলায় হরেকরকম মশলায় তৈরি রং চা... আহ! কী অনন্য স্বাদ। সবুজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাচাকে বললো, দেন আপনার তৈরি উন্নতমানের চা-ই দেন। সবুজ চা খাচ্ছে। কয়েকটি মাছি সবুজের মাথার উপরে ঘুরপাক খাচ্ছে, ভনভন শব্দ। হঠাৎ একটি মাছি সবুজের নাকের উপর বসলো। সবুজ চা খেয়েই চলেছে, কোনো দিকে তার কোনো খেয়াল নেই। সে যেন শত বছরের স্মৃতি জড়ানো এক নীরব কিংবদন্তী। হঠাৎ গানের শব্দে সবুজের ধ্যান ভাঙে। চাচা হেসে বললেন এতক্ষণ কারেন্ট ছিলো না। আসলে গান ছাড়া আজকাল দোকান জমে না। হাসবে নাকি কাঁদবে সবুজ বুঝতে পারে না।

সবুজ আবারো হাঁটছে একা... একা...। এবার দুপুর গড়িয়ে বিকেল নেমে এলো। সবুজের পা ব্যথায় টনটন করছে তবুও সবুজ হাঁটছে। হঠাৎ সবুজ লক্ষ করলো রাস্তার পাশে কয়েকটি ছেলে ক্রিকেট খেলছে। সবুজ তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর জিজ্ঞেস করলো, তোমরা রাস্তায় খেলছো কেন? ওরা বললো– মাঠ নেই, তো কোথায় খেলব? সবুজ অনেকটা বোকা হয়ে গেলো। সত্যিই তো এই প্রশ্নটা করাটাই তো বোকামি। মাঠ নেই তাহলে তারা খেলবে কোথায়। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো। সবুজের পায়ের ব্যথাটা ক্রমে বেড়েই চলেছে। সবুজের মাথাটা বার বার চক্কর দিচ্ছে এবং বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছে। সবুজ ধপাস করে রাস্তার একপাশে পড়ে গেলো। সবুজ বুঝতে পারছে, সে জীবন আর মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পৌঁছে গেছে। কিন্তু হয়তো মৃত্যু যন্ত্রণা তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। সবুজের চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছে। তার মনে পড়ছিলো– কোনো এক সময় এই

গ্রামে (যেটা এখন তথাকথিত শহর) বিশাল খোলা জায়গা ছিলো, খেলার জন্য সুবিশাল মাঠ ছিলো, সবুজ অরণ্য ছিলো, হাজারো পাখির কলরব ছিলো, বিশাল আকারের জলাধার ছিলো, ধানক্ষেত ছিলো, আরো কত কী!

গ্রীষ্মের খাঁ খাঁ করা দুপুরের রোদে খোলা আকাশে লাল, নীল ঘুড়ির অবাধ চঞ্চলতা। বর্ষায় বৃষ্টিতে সিক্ত কদমফুলের সৌন্দর্য। শরতের আকাশে ভেসে চলা সাদা মেঘের অপরূপ সুন্দর ভেলা। সবুজের মৃত্যু যন্ত্রণা আরো বাড়তে থাকে কিন্তু সবুজ আস্তে আস্তে নিজেকে আরো শীতল অনুভব করছে। তার আরো মনে পড়ছে– হেমন্তের অপরূপ সৌন্দর্য ফুরিয়ে যখন শীত আসে, তখন নতুন ধানের নবান্নের উৎসব, খেজুর রসের গুড়, পিঠা, ভোরের কুয়াশা আর সবুজ প্রকৃতি মিলে একাকার। আহ! কী অপরূপ সৌন্দর্য। সবুজের মুখ থেকে রক্ত বের হতে থাকে। সবুজ বুঝতে পারে, সময় হয়তো শেষ। অবশেষে সবুজের (বিদেহী আত্মার আক্ষেপ) আক্ষেপ বসন্তের কোকিলের ডাক সে আর কখনো শুনতে পারবে না। সবুজের নিথর দেহ পড়ে থাকলো অবহেলায় রাস্তার একপাশে।

প্রিয় পাঠক, আসলে সবুজ এই বাংলার অপরূপ প্রকৃতিকে অনেক অনেক বেশি ভালোবাসতো। এই ভালোবাসার প্রকৃতি যখন দিন দিন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলো তিল তিল করে, প্রকৃতি নিধন করে তখন গড়ে উঠছে বিশাল বিশাল ইট পাথরের ইমারত। তৈরি হচ্ছে কালো পিচঢালা পথ। সবুজ এই নিষ্ঠুর প্রকৃতি নিধন কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু তার একার পক্ষে তেমন কিছুই করার ছিলো না। তাই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো নীরবে। কিন্তু এই মৃত্যু শুধুই কি একজন মানুষের মৃত্যু। আমি তা মানতে রাজি না। এ মৃত্যু সমস্ত প্রকৃতি নিধনকারীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এক চরম প্রতিবাদ।

আজকাল আর মুক্ত আকাশ দেখা যায় না। চারদিকে শুধু দালান আর দালান। স্পর্শ করে না ষড়ঋতু পরিবর্তনের ছোঁয়া। আসলে আমার মনে হয় কি জানেন, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জ্ঞানের ভাণ্ডার এই সবুজ প্রকৃতি। একবার চোখ বন্ধ করে ভাবুন তো অরণ্যহীন কোনো এক পৃথিবীর কথা। সবুজ গাছপালা তথা বিশাল প্রকৃতি ছাড়া প্রাণীকূল তথা মানুষ কখনো কি বাঁচতে পারে। প্রকৃতি আমাদের কী দেয়নি, বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন, খাবার, ঔষধ, সৌন্দর্য সব দিয়েছে। কিন্তু আমরা প্রকৃতিকে কি দিয়েছি বলতে পারেন? সবুজের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি– অনুগ্রহপূর্বক কেউ গাছ তথা প্রকৃতি নিধন করবেন না। হয়তো কোনো এক সময় প্রকৃতি নিধন-ই পৃথিবী ধ্বংসের অনেক বড় কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আপনি নিজে যেনো সেই ধ্বংসের অংশীদার না হোন।

আসলে সবুজের আত্মার হাহাকার তথা মৃত্যুর মাধ্যমে আমি এই সবুজ অরণ্য তথা সুবিশাল প্রকৃতির আত্মার হাহাকার ও ভবিষ্যত শংকাকে বুঝাতে চেয়েছি। ধন্যবাদ।

‘না’ বলার সীমা নির্ধারণ করতে জানা

কাজী তৌহিদুল ইসলাম
সিনিয়র ম্যানেজার
ব্যাবিলন প্রিন্টার্স লিমিটেড

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের সর্বদাই অন্যের অনুরোধ শুনতে হয়। অপরের সাহায্য করাকে ভালো অভ্যাস বলা হয় ঠিকই কিন্তু ক্রমাগত তা করতে থাকলে, আমাদের নিজেদের জরুরি কাজের জন্য হাতে সময় থাকে না। যে কাজ করার জন্য আমাদের সময়, ইচ্ছা বা শক্তি থাকে না, অপরের জন্য সেই কাজ করতে হলে আমাদের ভিতরে হতাশা বোধ জন্ম নেয়।

যখন আমাদের কোনো কাজ করতে বলা হয়, আমাদের না বলার ইচ্ছা থাকলেও আত্মবিশ্বাসের অভাবের জন্য আমরা না বলতে পারি না এমনটা কেন হয়? নিম্নে এর কারণ উল্লেখ করা হলোঃ

 * হয়তো আপনি এই ভেবে ভয় পান যে, অন্যেরা আপনাকে পছন্দ করবে না বা আপনি সবাইকে সন্তুষ্ট করতে চান।
 * আপনি সর্বদা নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চান যাতে নিজেকে ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরূপে প্রদর্শিত করতে পারেন।
 *আপনার মনে হয় যে, চুপচাপ না বসে থাকাই ভালো তাই অবসর সময়ে অপরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা যেতেই পারে।
 * না বলার পরিনাম কি হতে পারে আপনি সেটা ভেবে ভয় পান, আর পরিনামের ভয়েই আপনি না বলতে পারেন না।

আপনি যখন সীমা নির্ধারণ করতে শিখে যান এবং না বলতে শুরু করেন তখন আপনার জীবন সুন্দর হতে শুরু করে। এর জন্য আপনাকে স্পষ্টরূপে বলাটা খুবই জরুরি হয়ে ওঠে। বন্ধু, সহকর্মী, পরিবারের লোকদের কথায় অসম্মতি জানানোর বিষয়টি একান্তই আপনার নিজের সিদ্ধান্ত। কর্মস্থলে পরিবারে বা বন্ধুদের মধ্যে আপনি সরাসরি না বলা শিখতে পারেন। নিম্নে এমন তালিকা দেওয়া হলো, যা গ্রহণ করে আপনি না বলার কৌশল শিখতে পারেন।

১। সম্পূর্ণ তথ্য জানেন কি না তা দেখে নিনঃ

যে কাজ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হবে তা করার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে আপনি সেই সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন কি না তা দেখে নিন। যদি সম্পূর্ণ তথ্য না জানেন তবে আপনার ভ্রান্তি হতে পারে এবং সম্পূর্ণ তথ্য না জানলে আপনার সিদ্ধান্ত নিতেও অসুবিধা হতে পারে। কাজের সম্পর্কে সামনের লোককে প্রশ্ন করার সম্পূর্ণ অধিকার আপনার আছে।

২। নিজেকে জিজ্ঞাসা করুনঃ এটা অনুচিত অনুরোধ কি?

যখনই কেউ কোনো অনুরোধ করে তার সঙ্গে স্বার্থ জড়িয়ে থাকে। যে ব্যক্তিকে অনুরোধ করা হয় তার হিত সম্পর্কে ভাবা হয় না। যদি অনুরোধ শুনে আপনার অনুচিত বলে মনে হয় তবে সরাসরি না বলে দিন। অনুরোধ শুনে আপনার অসহ্য লাগলে সেই অনুরোধ মেনে নেওয়া উচিত হবে না।

৩। সময় নিনঃ

আপনাকে কেউ অনুরোধ করলে সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব দিতেই হবে এর কোনো মানে নেই। সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে ভালো করে বিচার বিবেচনা করে নেবেন। সহজভাবে বলুন, এই সম্পর্কে ভাবার জন্য আমার একটু সময় লাগবে, চিন্তা করে বলব।

৪। লক্ষ্য তৈরি করুনঃ

আপনি যখন নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করে ফেলবেন তখন না বলা অনেক সুবিধাজনক হয়ে উঠবে। আপনি যদি নিজের গুরুর্ত্বপূর্ণ কাজগুলিকে নির্ধারণ করে নিতে পারেন তাহলে কাজের জন্য আপনি কতটা সময় দিতে পারবেন তা ঠিক করা অনেক সুবিধাজনক হয়ে উঠবে।

৫। অজুহাত না করে বা ক্ষমা না চেয়ে সহজভাবে বলুনঃ

যখন আপনি সমস্ত তথ্য জানবেন এবং না বলার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিবেন তখন শান্তভাবে স্পষ্ট করে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিন। গুরু গম্ভির অনুকূল শারীরিক ভাঙ্গিমার দ্বারা আপনি সামনের লোককে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিন।

দুর্বল হবেন না। কোনো রকম সংকোচ না করেই না বলে দিন। আপনি যদি সংকোচ বোধ করেন তবে মনে হবে যে আপনি নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে সংশয়ের মধ্যে আছেন। আপনি যদি বলেন, আমার খারাপ লাগছে কিন্তু... তাহলে আপনার পক্ষ দুর্বল বলে ধরা হবে। আপনি কি বলবেন যদি তা ঠিক করেই ফেলেন তাহলে অজুহাত বানানোর বা ক্ষমা চাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

৬। চাপ দেখে ঘাবড়াবেন নাঃ
না বলার সিদ্ধান্তটিকে নিজের জন্য উপকারি ও সুবিধাজনক বলে ধরুন। একটা কথা মনে রাখবেন যে, আপনি নিজের বিবেক থেকে এই সি্দ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে্ আপনার হিত সাধিত হবে।

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলে

নাসরিন আক্তার
জুনিয়র ওয়েলফেয়ার অফিসার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

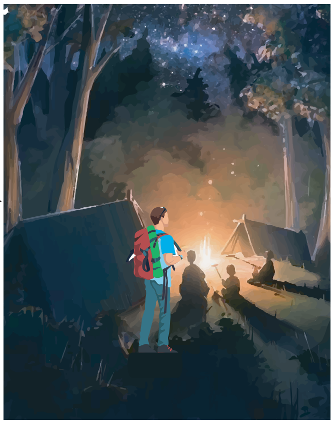

আজ রবিবার ঘুম থেকে খুব সকালে উঠতে না উঠতেই কেন যেন এত কিছুর ভিড়ে 'আজ কী বার?' এটাই ছিলো আমার মস্তিষ্কের প্রথম বার্তা। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে রোদ চোখের উপর এসে পড়লো। তার মানে জানান দিলো, আমাকে এবার উঠতে হবে। প্রতিদিন সকালে নির্দিষ্ট সময়ে একটি ফোন আসে– মায়ের ফোন। ফোনটা রিসিভ করা মাত্রই একটাই কথা– উঠেছিস? শরীরটা ভালো? খেয়ে যাস কিন্তু। মাঝে মাঝে মনে হয় ঐ কথাটা বলার জন্যই রাতের শেষ প্রহর থেকে ঐ নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করতে থাকে। নিজের সব কাজ শেষ করে বেরিয়ে পড়লাম।

বেশ কিছুদিন থেকেই শত ব্যস্ততার মাঝে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছিলাম। কাজেও আজকাল ছোট খাটো ভুল হচ্ছে। ব্যস্ততাকে নিজের জীবনে খুব কঠিনভাবে বরণ করেছিলাম। যেদিন জীবন থেকে সবকিছু হারিয়েছিলাম। ধরেই নিয়েছিলাম ব্যস্ততা, কাজ, অফিস এসব কিছু ছাড়া আমি আমার দেহের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারবো না। অফিসে পৌঁছতেই আমাদের অফিস পিয়ন সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলো– কেমন আছেন? খুব হাস্যোজ্জ্বল প্রাণবন্ত একটি ছেলে আবার প্রচণ্ডরকম শৌখিনও বলা যেতে পারে। তিন দিনের জন্য ঘুরতে যাবার উদ্দেশে ছুটি নিয়েছিলো অফিস থেকে। বললাম, ভালো আছি। কেমন কাটলো তোমার ভ্রমণ? উত্তরে বললো, ভালো। পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে গড় গড় করে বলতে লাগলো ওর ভ্রমণ কাহিনী। সিটে গিয়ে বসলাম। ছেলেটি চলে গেল।

সারাদিন শত ব্যস্ততার মাঝে বারবার পিয়ন ছেলেটির ভ্রমণ কাহিনী মনে পড়ছিলো। প্রতি বছর সবাই একসাথে অফিস থেকে ট্যুরে যাই। কেন যেন কোনোদিন ওর মতো ভ্রমণ কাহিনী কাউকে বলতে পারিনি, কারণ সেখানে যা কিছু হয় সবকিছুই থাকে অন্যের তৈরি করা পরিকল্পনায়। নিজের বলতে কিছুই থাকে না সেখানে। নিজেকে প্রকৃতির মাঝে বিলিয়ে দিয়ে একান্ত নিজের মধ্যে থাকার সুযোগটাও হয়ে ওঠে না।
অফিস শেষে বাসায় পৌঁছে ফ্রেশ হয়েই চলে গেলাম রান্না ঘরে। রান্না করতে করতে মনে

হলো এত বছর কর্মব্যস্ততার মাঝে নিজের জন্য একান্ত প্রয়োজন না হলে ছুটি নেইনি। সেজন্য বেশ কয়েকবার বেস্ট এমপ্লয়ি হিসেবে পুরস্কারও পেয়েছি। কিন্তু এবার সেই রেকর্ডটা ভাঙতে ইচ্ছে করছে। খুব ক্লান্ত আমি। এবার মনে হয় আমি বিষিয়ে উঠছি। না, সেই সুযোগ নিজেকে দেয়া যাবে না। কিছুদিনের জন্য দূরে কোথাও যাবো। একদম একা।

পরদিন ছুটির আবেদন করতেই তা পাশ হয়ে গেল। এবার চিন্তা কোথায় যাবো। যেহেতু ছুটি শুরু হবে আরও তিনদিন পর থেকে। গুগল মামা ঠিক খুঁজে দেবে কোথায় যাবো। তার আগে কিছু কেনাকাটা করতে হবে। লিস্ট করে সব কেনাকাটা শেষ। গুগল মামাকে জিজ্ঞেস করতে করতে জায়গাটাও সিলেক্ট করে ফেললাম। এবার শুক্রবারের অপেক্ষায়। টিকেটও কাটা হয়ে গেল। জায়গাটির নাম না হয় আজ নাই বললাম।

শুক্রবার খুব সকালেই উঠে পড়লাম। প্রকৃতির সৌন্দর্যের এক একটি ধাপ চোখে পড়তে শুরু করলো। খুব অবাক আর অসহায় লাগছে নিজেকে নিয়ে। একটু সময় ভালো থাকার জন্য আমার ভেতরকার সেই হাপসে উঠা দীর্ঘশ্বাসকে অনেক দূরে গিয়ে সবার অজান্তে এই কোলাহলমুক্ত পৃথিবীর বাইরে অন্য আরেক পৃথিবীতে যাবার উদ্দেশে আমার আজকের এই ছুটে চলা। গুগল মামা যখন জায়গাটা সিলেক্ট করে দিলো তখন খুঁজে খুঁজে দেখলাম সেখানে আমার এক বন্ধুর বাড়ি। কেউ থাকে না শুধু একজন বয়স্ক লোক বাড়িটির দেখভাল করে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ পৌঁছলাম আমার সেই স্বপ্নের রাজ্যে। সবকিছুর ব্যবস্থা থাকাতে বাড়ি পৌঁছতে কোনো বেগ পেতে হয়নি। এত সহজে অল্প সময়ে সবকিছুর ব্যবস্থা হয়ে যাবে তা ভাবতেও পারিনি। আবার প্রমাণ হলো, ইচ্ছাশক্তির কাছে অনেক কিছুই হার মানতে বাধ্য। বাড়ির সামনে পৌঁছতেই সেই কেয়ারটেকার চাচা হাজির। আমার বন্ধু তাকে সবকিছু আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিলো।

ঘরে ঢোকার আগে বারান্দায় বসে পড়লাম। অসম্ভব সুন্দর একটি বাড়ি। চোখ ফেরানো দায়। তারপর ফ্রেশ হলাম। বিকেলের নাস্তার সাথে চা খেতে খেতে কেয়ারটেকার চাচার সাথে অল্প সময় গল্প হলো। আর জেনেও নিলাম এখানে কোথায় কি আছে? কিভাবে যেতে হয়। সবকিছু ব্রেনে সেট করে নিলাম। অনেকটা পথ এসেছি, একটু ক্লান্তি লাগছে তাই খুব বেশি রাত না করে রাতের খাওয়া দাওয়া শেষে শুয়ে পড়লাম।

রাতের শেষ প্রহর। ভোর হতে আরো কিছুটা সময় বাকি, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা ছেড়ে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাতের চারপাশের অন্ধকার ক্রমে তার অস্তিত্ব হারাচ্ছে। রাতের আকাশের চাঁদ আর তারার গল্পের সূচনা হচ্ছে আজকের মতো। হয়তো আগামী দিনের অপেক্ষায় যে যার মতো বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আর কিছু সময় পর আলোকিত হয়ে যাবে পৃথিবী। একটা রাত যেমন জানে না আলোকিত পৃথিবী কতটা সুন্দর, ঠিক তেমনি আলোকিত পৃথিবীও জানে না অন্ধকারে চাঁদ আর তারার মিলনস্থল কতটা সুন্দর! ভোরের

অপেক্ষায় ঘুম আর হলো না। ভোরের আলো ফুটতেই ফ্রেশ হয়ে তৈরি হয়ে গেলাম। চাচাকে আগের দিনই বলেছিলাম বাইরে থেকে ঘুরে এসে নাস্তা খাবো।

বাড়ির ঠিক ডানপাশ দিয়ে একটা সুন্দর রাস্তা ঠিক করে নিলাম। এটাই হবে আমার প্রথম যাত্রা। অসম্ভব সুন্দর প্রকৃতি, সবুজের একটা ঘ্রাণ খুঁজে পাচ্ছি। কিছুদূর যেতে না যেতেই রাস্তার পাশে গাছের নিচে ঝরা ফুল বিছানো দেখতে পেলাম। ফুলগুলোর নাম ঠিক মনে করতে পারছি না। কয়েকটা ফুল তুলে আনতেই মনে হলো– ফুলগুলো কখনও ভোর দেখেনি। রাতেই তার সৌরভ আর সৌন্দর্য প্রকৃতির মাঝে বিলিয়ে দিয়ে, রাতেই তার অস্তিত্ব হারিয়ে ঝরে পড়ে পৃথিবীর বুকে। দিনের আলোয় সে অক্ষম তার সৌরভ আর সৌন্দর্য বর্ধনে। যখন ঝরে যায় হয়তো খুব কষ্ট হয়, আর তো পারবে না সৌরভ ছড়াতে। আরতো পারবে না মৌমাছি আর জোনাকির সাথে গল্প করতে! ফুলটার নাম যেহেতু জানা নেই তাই নিজেই নাম দিয়ে দিলাম– অস্তিত্বহীন ঝরা ফুল। ঠিক আমার মতো! মনের কোনো অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু দেহের অস্তিত্ব।

রাস্তা ধরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে বেশ কয়েকটি বাড়ির আঙিনা চোখে পড়লো। দেখে মনে হচ্ছে সভ্যতার আধুনিকতা এখনও আষ্টেপিষ্টে খুব একটা স্পর্শ করতে পারেনি তাদের। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শব্দ করে পাঠ্য বই পড়ার শব্দ কানে ভেসে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে চলে গেলাম সেই ছোট্টবেলার দিনগুলোতে। আমরাও ঠিক এভাবেই পড়তাম। মা বলতো– শব্দ করে পড়লে নাকি নিজের ভুল নিজেই বুঝতে পারা যায়। আজকালকার ছেলে মেয়েরাতো হেড ফোন লাগিয়ে মুখ বন্ধ করে বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। কতই না পার্থক্য এ যুগ আর সেই যুগের। কিছুদূর যেতে না যেতেই চোখে পড়লো প্রায় আশি বছরের এক বৃদ্ধ লোক লাঠি ভর দিয়ে ছোট ছোট করে পায়ের কদম ফেলতে ফেলতে যাচ্ছিলো। একটু জোরে হেঁটে তার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলাম। তার সামনে গিয়ে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম– ভালো আছেন? আপনি কি এ গাঁয়েই থাকেন? দুটো প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগেই পাল্টা প্রশ্ন করে বসলো আমাকে– কে আপনি? কোথায় থাকেন? হেসে উত্তরটা আমিই আগে দিলাম। এখানে বেড়াতে এসেছি। আপনি? বললেন হ্যাঁ, এ গাঁয়েই থাকি। রোজ সকালের খোলা হাওয়া আমার শরীরে না লাগালে মনটা ভরে না। আর সলিমের দোকানের আদা চা আমার লাগবেই। ‘তাই নাকি! আজ আমিও যেতে চাই আপনার সাথে।’ বুঝলাম, আসলেই সলিমের দোকানের আদা চা মনে রাখার মতোই অসাধারণ। চা খেতে খেতে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করলাম লোকটির সাথে। একটা সময় নিজে থেকে বিদায় নিলো লোকটি। আবার শুরু হলো আমার পথ চলা।

কিছুদূর যেতেই চোখে পড়লো একটা চারকোনা আকৃতির পুকুর। যেখানে ফুটে আছে অজস্র শাপলা ফুল। একজন কিশোরী সযতনে শাপলা ফুল তুলছে। কতদিন শাপলা ফুল স্পর্শ করিনি। মেয়েটির কাছে গিয়ে একটি ফুল চাইলাম। একবার নয়, অনেকবার চাইলাম।

ফুলতো দিলোই না বরং একটা কথাও বললো না। রাগ হলো, কেমন মেয়েরে বাবা! হঠাৎ ছয়-সাত বছরের একটি ছেলে এসে বললো– ও কথা বলতে পারে না, কানেও শোনে না। আপনাকে আমি ফুল এনে দিচ্ছি। ছেলেটিকে বললাম, তুমি কে? সে জানালো আমি ঐ মেয়েটির ভাই। আজ ঘরে রান্নার কিছু নেই তাই শাপলা নিয়ে মাকে দেব রান্না করবে। বাকশক্তিহীন এত সুন্দর একটি মেয়ে! ওর মধ্যে আমি আমাকে দেখলাম। যখন প্রচণ্ড কষ্ট একসাথে আমাকে চেপে ধরে তখন আমিওতো আমার বাকশক্তি হারিয়ে ফেলি। কাউকে কিছু বলতে পারি না। নাহ! এখানে থাকা যাবে না। দ্রুত চলে গেলাম ওদের কাছ থেকে। আস্তে আস্তে রোদ চড়াও হয়ে যাচ্ছে। স্থির করলাম বাড়ি যাবো। আবার বিকেলে বের হব। শুনলাম এখানে খুব কাছেই ছোট্ট একটা নদী আছে। এবার তাকে দেখার অপেক্ষায়।

বাড়ি ফিরতে না ফিরতে চাচা নাস্তা হাতে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললাম– রেখে যান, ফ্রেশ হয়ে খেয়ে নিব। চাচা আপনি খেয়েছেন তো? বললো হ্যাঁ, গ্রামের মানুষতো খুব সকালেই খাওয়ার অভ্যেস আমাদের। নাস্তা শেষ করে উঠোনে গিয়ে দেখি চাচা বাগান থেকে সবজি তুলছে দুপুরের রান্নার জন্য। শহরের ভেজালযুক্ত খাবার খেয়ে খেয়ে এখন বিষও হজম হয়ে যায়, সেখানে গাছ থেকে তুলে আনা টাটকা সবজি রান্না নিশ্চয়ই টেস্টি হবে। চাচা হাসছিলেন আমার কথাগুলো শুনে। হঠাৎ বাড়ির সামনে থেকে একদল লোক বলতে বলতে যাচ্ছিলো ম্যাজিস্ট্রেটের মা মারা গেছেন। চাচাকে জিজ্ঞেস করলাম, কে এই ম্যাজিস্ট্রেট? কী হয়েছিলো তার মায়ের। চাচা বলছিলো আহারে বড়ই ভালো মানুষ ছিলেন। এ গাঁয়ের একজন ছেলে যে আজ ম্যাজিস্ট্রেট। এ গাঁ থেকে প্রায় আধা ঘণ্টার পথ। একটা ছোট্ট মফস্বল এলাকা, সেখানে বৃদ্ধাশ্রমে থাকেন তার মা। মনে হয় সেখানেই মারা গিয়েছেন। অবাক লাগলো, এজন্যেই হয়তো বলে, ‘একজন মা নিজের সর্বস্ব দিয়ে দশটি সন্তানের দায়িত্ব নিতে পারেন, আর একজন মায়ের দায়িত্ব দশটি সন্তান কেন নিতে পারে না!’ দুপুর গড়িয়ে বিকেল, ঘড়ির কাটায় সময় চারটা। চাচাকে বলেই বের হলাম ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হবে, চিন্তা করবেন না। নদীর ধার ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে আমি মনে হয় পঁচিশ বছর আগের সেই জীবনে চলে গেলাম। যে খেলাধুলাগুলো আমরা করতাম, এখানকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে তা এখনও বিরাজমান। কেউ ডাংগুলি, কেউ কানামাছি, কেউ আকাশে রঙ বেরঙের ঘুড়ি উড়াচ্ছে। আবার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে জলকেলি খেলছে। এখনকার ছেলেমেয়েদের খেলার উপকরণ হচ্ছে তাদের মোবাইল। শারীরিক কসরত করে কিভাবে খেলাধুলা করতে হয় তা তাদের জানা নেই। কতই না মধুর ছিলো ইন্টারনেটের আগের দিনগুলি। বিকেল গড়িয়ে সূর্য তখন একটু একটু করে আলোকিত পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছিলো। দূরে ছেলেমেয়েদের কোলাহল থেকে সরে নদীর ধারে বসলাম। হঠাৎ মনের কোণে বেজে উঠলো জগজিৎ সিংয়ের সেই গান–

নদীতে তুফান এলে কূল ভেঙে যায়
সহজে তাকে দেখা যায়,

মনেতে তুফান এলে মন ভেঙে যায়
দেখানোর নেই যে উপায়।
মনে হচ্ছে আজ চিৎকার করে বলি– ও নদী, তোমার কূল ভেঙে গেলে তা সবাই দেখে কিন্তু তোমার বিকৃত হয়ে যাওয়ার কষ্ট তো কেউ দেখে না। আজ আমি তোমার মতো ভাঙা মন নিয়ে তোমার সামনে হাজির হয়েছি, যা কেউ কখনো দেখেনি। আজ তোমার সঙ্গী তোমার উপর বয়ে চলা উত্তাল ঢেউ আর আমার সঙ্গী হাজার কষ্টে ভরা মন। আজ তোমার স্রোতের আয়নায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছি। তোমার অন্তরালে আমিও আছি। আজ শুধু তুমি, আমি আর তোমার ঢেউ।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল। খানিকক্ষণ বসে রইলাম নিরালায়। ছেড়ে আসতে কষ্ট হচ্ছিলো নদীকে, তবুও যেতে হবে। চলে আসার সময় বারবার পিছন ফিরে তাকিয়ে একটা কথাই মনে পড়ে বারবার। আমিতো ওকে একরাশ কষ্টে ভরা চোখের জল উপহার দিয়ে নিজেকে স্বার্থপরের মতো হালকা করে এলাম। অভিমান করলো না তো আমার সাথে! শরীরের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে তবুও যেতে হবে আমার গন্তব্যে। বাড়ি ফিরে হাতমুখ ধুয়ে বারান্দায় বসতে না বসতে চাচা চা আর সন্ধ্যার নাস্তা নিয়ে হাজির। নাস্তা হিসেবে যেখানে পিৎজা, বার্গার, আরও কত কি খেতাম! সেখানে সযতনে বানানো পিঠা, ভাবাটাই দায়। চাচা অপলক তাকিয়ে ছিলো আমার পিঠা খাওয়া দেখে। গ্রামের মানুষরা স্বভাবতই অতিথিকে আপ্যায়ন করতে পছন্দ করে। আমার বাবাকেও দেখেছি অন্যকে খুশি করার মধ্যে নিজের খুশি খুঁজে পেতেন। চাচা জিজ্ঞেস করলেন– সকাল আর বিকেল মিলেতো অনেক ঘুরলেন, কেমন লাগলো? উত্তরে বললাম– শুধু ভালো বললে কম হবে তার চেয়েও বেশি। চাচা বললো বড়ই ভালো মানুষ আপনি। চাচা, আপনি অনেক সরল তাই খুব সহজে আমাকে মেপে ফেললেন। আজকাল ভালোর সংজ্ঞা নেই। –কী জানি বাপু বুড়ো মানুষের আর বোঝা। চায়ে চুমুক দিতে দিতে চাচাকে জিজ্ঞেস করলাম– আপনজন বলতে কে কে আছে আপনার? একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উত্তর দিলো– সবাই ছিলো, আজ নেই। মা আছে, তা থেকেও নেই। বলতে বলতে চোখ টলমল করছিলো নোনা জলে। আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ না দিয়ে রাতে কি খাবো তার অজুহাত দেখিয়ে চলে গেল। আবারও আর একজনের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করলাম। হঠাৎ চোখে পড়লো, বাড়ির পশ্চিম পাশে একটা ডালিম গাছে অজস্র জোনাকির আনাগোনা। এ দৃশ্যতো ছেড়ে এসেছি সেই ছোটবেলায়, যখন উঠোনের মাঝখানে পাটি বিছিয়ে দাদু রূপকথার গল্প শোনাত। কত বছর পর চারিদিক নিস্তব্ধ, ঝিঁঝিঁ পোকার গান, জোনাকি পোকার লুকোচুরি, সব মিলে এক অসাধারণ সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, ভালো থাকার জন্য শুধুই ফেসবুক, মোবাইল আর ইন্টারনেট! না, প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েও ভালো থাকা যায়। ইন্টারনেটের জগতের আড়ালে আরও শক্তিশালী একটা জগৎ আছে। তাকে কষ্ট করে কজনই বা খুঁজে বেড়ায়! কিছু সময় একান্তে কাটানোর পর রাত যখন ৯:৩০, তখন চাচাকে বললাম, খাবার কি এখনই খাব? চাচা বললেন– হ্যাঁ, সব তৈরি। আপনি খাবার ঘরে চলে আসুন। খেতে খেতে চাচাকে প্রশ্ন

করলাম এখান থেকে দূরে যে বৃদ্ধাশ্রম আছে সেখানে কিভাবে যেতে হয়? চাচা জিজ্ঞেস করলেন– কেন? উত্তরে বললাম– কাল সকালে যাব সেখানে। চাচা খুব সহজ ভাষায় লোকেশনটা বললেন। আমিও এক ঝলকে ব্রেনে সেট করে নিলাম। যেহেতু খুব সকালে যাবো তাই বেশি রাত না করে খাওয়া দাওয়া শেষে ফ্রেশ হয়ে বিছানায় চলে গেলাম। বিছানায় শুতে না শুতে হঠাৎ একটা অচেনা পাখি তার নিজস্ব ভাষায় ডাকতে ডাকতে জানালার ওপাশে একটি গাছের ডালে এসে বসলো। বিছানা ছেড়ে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওকে দেখে মনে হচ্ছে পথ হারিয়ে ফেলেছে। খুঁজে পাচ্ছে না রাতের আড়ালে ওর গন্তব্য। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিলো আমার দিকে। আমিও কথা জুড়ে দিলাম ওর সাথে।

ও পথ হারা পাখি কেঁদে ফেরো একা
আমার হৃদয় শুধু আবেগের লেখা।

তুমি পথ হারিয়ে কাঁদো, আর আমি পথ চিনেও কাঁদি। তোমার অন্তরালে আমিও আছি। অতি আবেগে নিজের সাথে নিজেই হাসলাম। কামনা করছি অচেনা পাখি, ফিরে পাও তোমার সঙ্গীদের। ফিরে পাও তোমার ঘর। ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিছানায় শুতে না শুতে একরকম ঘুম এসে ভর করলো আমার চোখ জুড়ে।

খুব সকাল, কাক ডাকা ভোর হতেই ঘুম ভেঙে গেল। এতটা প্রশান্তির ঘুম চোখে ভর করেনি বহু বছর। শান্তিকুঞ্জে সবকিছুই শান্তিময়। দেরি না করে বিছানা ছেড়ে ফ্রেশ হয়ে তৈরি হলাম এর মধ্যে চাচা নাস্তা নিয়ে এলেন। নাস্তা শেষে বেরিয়ে পড়লাম। গ্রামের আঁকাবাকা পথ শেষ করে পাকা রাস্তা ধরে পৌঁছলাম সেই ছোট্ট মফস্বলের বৃদ্ধাশ্রমে। সেখানে নাকি আত্মীয় পরিজন ছাড়া কাউকে প্রবেশ করতে দেয় না। যাইহোক, গাইড ছেলেটিকে পাঠিয়ে ব্যবস্থা করে ফেললাম। ভেতরে ঢুকে কিছুদূর যেতেই চোখে পড়লো একটি হাসপাতাল বৃদ্ধদের চিকিৎসার জন্য। আর দু'চার কদম এগিয়ে একটা বেশ সুন্দর পুকুর। সকালবেলা শালিকেরা সেখানে নেচে নেচে পাখা ঝাপটে গোসল করছে। পুকুরের চারপাশে বেঞ্চ পাতা। হঠাৎ কিছু মানুষের কান্নার শব্দ। গাইড ছেলেটির দিকে তাকাতেই বলে উঠলো, হয়তো আজও আবার কেউ বিদায় নিয়েছে। কিছুদূর হাঁটতে হাঁটতে পুকুরের এক কোণে বেঞ্চে বসা এক বৃদ্ধ লোকের দিকে চোখ পড়লো। একলা মনে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। হয়তো ভাবছে আজ আমাদের এক সঙ্গী চলে গেছেন, কাল হয়তো ঐ মাটি আমাকেও তার বুকে টেনে নেবে। একটা ভয় জড়ানো চোখ। গাইড ছেলেটির কাছে জানতে পারলাম, এখানে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও নাকি আছেন। এখানকার বাচ্চাদের একটা স্কুলে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে পড়ান। জীবনের সবচেয়ে কাছের প্রিয়জনদের ছেড়ে আজ তারা নিঃসঙ্গ। কেউ নেই শেষ যাত্রায় তাদের কাছে। যাইহোক, একে একে কয়েকজনের সাথে কথা বললাম। মনের দাঁড়িপাল্লায় মেপে দেখলাম আমি তাদের কাছে নগণ্য। নিজেকে হালকা মনে হলো। আমিতো এদের চেয়ে বেশ ভালো আছি। সারাটাদিন কাটলো বৃদ্ধাশ্রমে। বিকেলে বাড়ির

উদ্দেশে রওনা হলাম। পড়ন্ত বিকেলের খোলা হাওয়ার মতো আজ আমি হালকা হয়ে গেছি। কোলাহলমুক্ত স্বার্থপর পৃথিবীর বাহিরেও যে আরেকটা সুন্দর পৃথিবী আছে, তা বুঝতে অনেক দেরি করে ফেলেছি।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাড়ি পৌঁছতে চোখে পড়লো চাচার খুশিভরা একটা মুখ। প্রশ্ন করলাম, কি হয়েছে চাচা? এতটা প্রাণবন্ত তো এই দুদিনে আপনাকে একবারও দেখিনি? বললেন, আজ নদীর ধারে বাউল গানের আসর বসবে। সবাই যাবো। চাচা বললো, যে গায়েন আসবে সে নাকি অসম্ভব ভালো গায়। খুব তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে চা খেয়েই চাচার সাথে রওনা হলাম। নদীর ধারে ছোট তাবু টানিয়ে গায়েনের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শহরের মতো আলোকসজ্জা নয়, শুধুই জ্বলছিলো চারপাশে হারিকেনের আলো। দর্শক হিসেবে ছিলো অধিকাংশ ষাটর্ধ্ব মানুষ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এসেছে। শুরু হলো একতারা, ডুগডুগি আর বাঁশির ধ্বনি। একে একে গাইতে শুরু করলেন– জাত গেল, জাত গেল, চিরদিন পুষলাম অচিন পাখি, দেখ না মন ঝকমারি এই দুনিয়াদারিসহ আরও কত গান! প্রত্যেকটি দর্শকের চোখে ফুঁটে উঠছিলো ভালোলাগার তীব্র বহিঃপ্রকাশ। এত অল্পে এত খুশি এরা! নদীর খোলা হাওয়ায় শীতল হয়ে গেল দেহ। কী করে ফিরে যাবো সেই স্বার্থপর পৃথিবীতে, হাতে সময় মাত্র একদিন। শান্তিকুঞ্জের শান্তির ডাকে আমায় কি সাড়া দিতে দেবে ঐ ব্যস্ত পৃথিবী?

শিয়ালবাবা কি জন্মদাতা বাবার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ

মো. মাহমুদ বিন এখলাছ (শাওন)
অফিসার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন ট্রিমস লিমিটেড

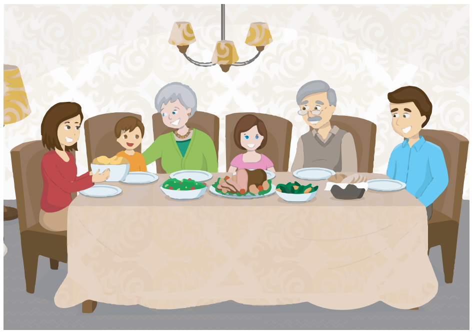

২০১১ সালের কথা। আমি তখন অনার্স ২য় বর্ষের ছাত্র। প্রথম ঘণ্টার ক্লাসের পর সেমিনার লাইব্রেরি কক্ষে বসে প্রতিদিনের পত্রিকা পড়ছিলাম। হঠাৎ পিয়ন এসে বললো, এখানে এখন পিএইচডি ক্লাস হবে। সবাই যেন বের হয়ে যায়। কিন্তু আমার বহুদিনের আশা ছিলো এ রকম একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করা। তাই বের হয়ে গিয়েও দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, কখন সবাই ঢুকে সে আশায়। যেহেতু অনার্স শেষ বর্ষের এবং মাস্টার্স এর ছাত্ররা অংশ নিতে পারে তাই আমিও সুযোগটা গ্রহণ করে সেমিনারে অংশগ্রহণ করলাম। উক্ত সেমিনার অর্থাৎ পিএইচডির বিষয়বস্তু ছিলো, "বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় খানকা মসজিদ এবং মাজারের ভূমিকা"। এটা ছিলো দ্বিতীয় সেমিনার। গবেষণার রিপোর্ট যখন সবাইকে দেয়া হলো তখন সবাই রিপোর্টের বিষয় নিয়ে গবেষককে প্রশ্ন করা শুরু করলো। উক্ত সেমিনারে দুজন ইমেরিটাস শিক্ষকসহ সিনিয়র সকল শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে যার কথাগুলো আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে তিনি হলেন, ড. মহিবুল্লাহ সিদ্দিকি [রাঃবিঃ] তিনি তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে কিছুটা স্মৃতিচারণ করলেন। সেটাই আমি এখানে তুলে ধরবো।

রাজশাহী জেলার পুটিয়া থানার অন্তর্গত একটি মাজার রয়েছে, যা শিয়ালবাবার মাজার নামে পরিচিত। হয়তো ভাবছেন এটা আবার কেমন মাজার? হ্যাঁ, আমাদের দেশে যেমন মাজারের শেষ নেই, ঠিক তেমন নামেরও শেষ নেই। অনেকদিন আগের কথা। গ্রামে তখন লোকজন কম ছিলো। ফলে ঝোপঝাড়ের অভাব ছিলো না। অভাব ছিলো না শিয়াল, বনবিড়ালসহ নানারকম বন্য প্রাণীর। প্রায়ই গ্রামের মানুষের হাঁস-মুরগি, ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি নিয়ে যেত শিয়াল বা বন বিড়ালে। ফলে মানুষ এসব পশুর ওপর বিরূপভাবাপন্ন হতে শুরু করলো এবং দলবদ্ধ হয়ে এদের মারতে শুরু করলো। একদিন গ্রামের লোকজন একটি শিয়াল মারলো এবং গ্রামের ছোট বাচ্চাদের বললো শিয়ালটাকে কোথাও গর্ত করে পুঁতে রাখতে, যেন গন্ধ বের না হয়। দুষ্ট বাচ্চারা শিয়ালের লেজে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে বাজারের কাছে রাস্তার

ধারে রেখে চলে গেল।

পাশেই বসে এক ভিক্ষুক ভিক্ষা করতো। যারা বাজারে আসতো তারা ভিক্ষুককে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতো। দুদিন পর যখন শিয়াল পঁচে গন্ধ বের হতে লাগলো, তখন ভিক্ষুকটি বিরক্ত হয়ে নিজেই গর্ত খুঁড়ে শিয়ালটিকে পুঁতে রাখলো। গ্রামের সহজ-সরল মানুষ যখন ভিক্ষুকটির পাশে উঁচু মাটির ঢিবি দেখে ভাবতে লাগলো, হয়তো ভিক্ষুকের কোনো আত্মীয় মারা গেছে। ফলে মানুষজন তাকে বেশি করে দান করতে লাগলো। ভিক্ষুকটি বেশি টাকা পেয়ে ভাবলো, এটা নিশ্চয় মৃত শিয়ালের কারিশমা। তাই ভিক্ষুকটি মাটির ঢিবিটি ঘিরে দিলো এবং কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলো যেন বৃষ্টির পানিতে তা ধুয়ে না যায়। এটা দেখে লোকজন আরো বেশি দান করতে লাগলো এবং কালক্রমে সেখানে একটি মাজার গড়ে উঠলো। এটাই ছিলো শিয়ালবাবার মাজার তৈরির কাহিনী।

আসলে এভাবে আমরা বুঝে না বুঝে প্রতিনিয়ত শিয়াল বাবার মাজারে যাচ্ছি। টাকা-পয়সা, ফল-মূল সবকিছু সেখানে বিলিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু একবারও কি আমরা আমাদের জন্মদাতা বাবা-মাকে এরকম সম্মান করছি। আজ আমরা যখন কোনো মাজারে যাই তখন পাক-পবিত্র হয়ে যাই এবং মাজারের কোথাও কোনো ময়লা জমতে দেই না। কখনো কি ভেবেছেন, যে বাবা-মায়ের কোলে মল-মূত্র ত্যাগ করেছেন সে বাবা-মা কিন্তু আপনাকে কিছুই বলেনি। যাকে বাবা বানিয়েছেন, আজ যদি তার কাছে গিয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করেন তবে আপনার কি অবস্থা হবে তা আপনিই জানেন! আজ হয়তো আপনি, আমি সন্তান কিন্তু কাল সবাই বাবা-মা হবো। আজ যদি আমরা নিজের ঘরকে মাজারের মতো বানাই তবে কাল আমাদের সন্তানরাও আমাদের ঘরকে মাজার বানাবে এবং শিয়াল বাবার থেকে বেশি ভালোবাসবে। আসুন সবাই বাবা-মাকে খুব বেশি ভালোবাসি এবং তাদের সুখে রাখি। করোনার ভয়ে বাবা-মাকে রাস্তায় বা বনের ধারে ফেলে না দিয়ে তাদের যত্ন নেই, যাতে করোনা তাদের কাছে আসতে না পারে। আপনার আমার ভালোবাসাই পারে তাদের করোনা থেকে দূরে রাখতে।

‘ব্যাবিলন’ একটা ব্রান্ড

কাজী মাইনুল হোসেন
সহকারী ম্যানেজার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

– কি বলো তুমি, ওখানে জয়েন করবে না! ‘ব্যাবিলন’ একটা ব্রান্ড। আমরা ব্যাবিলন থেকে অনেক কিছু শিখি। বিভিন্ন বায়াররা গার্মেন্টস জগতের পথিকৃৎ মনে করে ব্যাবিলনকে। তুমি এটা কী বললে?

– আমি বললাম, ‘ম্যাডাম ব্যাবিলনে তো বেতন অনেক কম। অন্যখানে জয়েন করলে বেতন বেশি পাবো, তাছাড়া গাড়ির সুবিধাও আছে।
তারপরেও ম্যাডাম বললেন, ‘ব্যাবিলনে যাও, জীবনে কিছু শিখতে পারবে।’ ম্যাডামের গলার টোন এমন ছিলো যে, আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। কারণ উনাকে আমি অনেক শ্রদ্ধা ও সম্মান করি।

২০১২ সালের নভেম্বরের তিন তারিখ। দিনটি আমার জন্য স্পেশাল। এদিনেই জয়েন করেছিলাম ব্যাবিলন পরিবারে। ব্যাবিলন সম্পর্কে আগে থেকে বেশি কিছু জানতাম না। ব্যাবিলন আমার দ্বিতীয় চাকুরিস্থল। জয়েন করার পর আমার নাম নিয়ে একটা মজার অভিজ্ঞতা হলো। আমাদের পরিচালক মইনুল আহসান স্যারের সাথে আমার নামের কিছুটা মিল থাকায় আমাকে মাইনুল নাকি অন্য কোনো নামে ডাকবে তা নিয়ে বেশ মজা হলো। আমার ডাকনামের ব্যাপারে সবাইকে অবগত করলে শেষ পর্যন্ত সবাই আমাকে মামুন বলেই ডাকা শুরু করলেন। সেই থেকে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ হিসেবে ব্যাবিলনের সাথে আমার পথ চলা শুরু।

শাপলা নামে তখনকার একজন ওয়েলফেয়ার অফিসার আমাকে পুরো ভবনটি ঘুরে দেখালেন এবং সকল সেকশনের লোকজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার বস ছিলেন জেভিয়ার বিপ্লব দাস। বস বললে ভুল হবে, তিনি ছিলেন বন্ধুর মতো। ধীরে ধীরে ব্যাবিলন সম্পর্কে জানলাম। বিশেষ করে ব্যাবিলন গ্রুপের সিএসআর সম্পর্কে জেনে আমার বুকটা গর্বে ভরে গেল। এর মধ্যে বিশেষভাবে শিক্ষাবৃত্তি ও সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ উল্লেখযোগ্য। ব্যাবিলনের কর্মীদের লেখনি দ্বারা নিয়মিতভাবে প্রতি বছর ম্যাগাজিন প্রকাশ করার বিষয়টি বেশ ব্যতিক্রম মনে হলো। কর্মীদের সৃজনশীলতার খোঁজে এর আগে আমি অন্য কোনো পোশাক শিল্পে সাহিত্যচর্চার বিষয়ে শুনিনি। যদিও আমার লেখালেখির ব্যাপারে কোনো

আগ্রহ ছিলো না কখনোই। তবু কেন যেন আমি নিজেও কিছু লেখার একটা তাগিদ অনুভব করতাম সব সময়। তবে শুরু থেকেই কমপ্লায়েন্স এর মতো গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে কাজ করায় এবং কমপ্লায়েন্সের পরিধি অনেকটা আকাশের মতেই বিশাল হবার কারণে আর সময় বের করতে পারছিলাম না। এছাড়াও ব্যাবিলন গ্রুপে জাঁকজমকভাবে অনেক অনুষ্ঠানাদি হতো– বাৎসরিক মিলাদ মাহফিল, প্রীতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শীতবস্ত্র বিতরণ, বৃক্ষরোপন কর্মসূচি, হেলথ ক্যাম্পসহ নানা কর্মসূচি। এসব অনুষ্ঠান আয়োজনে ফ্যাক্টরি এইচআর থেকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিলো, যা সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করেছি সব সময়।

এখানে জয়েন করার কিছুদিন পরেই একটি অডিট ফেইস করতে হয়। ওপেনিং মিটিংয়ে ছিলেন শাহ আলম স্যার ও মাহমুদ স্যার। অডিটে প্রত্যেকেই ছিলেন খুবই সিরিয়াস। শাহ আলম স্যারের কথা যেন বুক ভেদ করে বেরিয়ে যেত! আর মাহমুদ স্যারের চোখরাঙানি যেন মনে ভয় ধরিয়ে দিত! যদিও অডিটের পর সব ভুলে যেতাম তাঁদের সহাস্য বাচনভঙ্গিতে। আসলে অডিটের ভালো ফলাফলে সবাই ছিলেন ভীষণ সিরিয়াস। পূর্ব নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী কেউ ফ্লোর গোছানো, কেউ ডকুমেন্টস তৈরি, কেউ সার্বক্ষণিক অডিটরের সাথে থেকে অডিট সাপোর্টে কাজ করে চলেছেন। নতুন হিসেবে আমাকে কেউ তেমন কিছুই বললেন না। তবে আমি লক্ষ্য রাখছিলাম অডিটে যেন কোনো ধরনের সমস্যা না হয় এবং প্রয়োজনে যেকোনো সাপোর্ট দেয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। সেদিন অডিট খুব ভালো হয়েছিলো।

এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন ব্রান্ডের, বিভিন্ন অডিট ফার্মের মাধ্যমে সোশ্যাল, টেকনিক্যাল, সিটিপ্যাট, সেফটি এবং আরও কত ধরনের অডিট যে ফেস করতে হলো তার হিসেব নেই। আমার কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন প্রথমে জেভিয়ার বিপ্লব দাস। তিনি আমার ওপর কমপ্লায়েন্সের পুরো দায়িত্ব না দিলে কখনোই এত বিশদভাবে শেখা হতো না। তখনকার রহিম ভাইয়ের কথাও উল্লেখ করতেই হবে। তার কাছ থেকে কোয়ালিটি কমপ্লায়েন্সের হাতেখড়ি হয় আমার। একটা সময় তিনি ব্যাবিলন থেকে চলে গেলে আমাকেই টেসকো, ওয়ালমার্ট, সেইন্সবেরির মতো ব্রান্ডের টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্সের অডিটগুলো ফেইস করতে হয়েছে এবং খুব ভালোভাবে অডিটগুলো ফেইস করতে পেরেছি তাঁর কাছ থেকে শেখার কল্যাণে। মাহমুদ আলম সিদ্দিকি স্যারের কথা না বললেই নয়। তিনি আমাকে কাজের ক্ষেত্রে অনেক সহযোগিতা করেছেন এবং কমপ্লায়েন্স এর অনেক খুঁটিনাটি বিষয় শিখিয়েছেন হাতে কলমে।

আমার বাসা ছিলো রামপুরায়। এমন অনেক দিন গেছে নিজের কাজের প্রয়োজনে এবং নিজ ইচ্ছাতেই অডিটের কাজে প্রচুর সময় দেয়ার জন্য রাত ১২ টার পরও বাড়ি ফিরেছি। প্রথম প্রথম নিজের প্রতি বিরক্ত হতাম, খুব কষ্টও হতো কিন্তু আমি কখনো কোনো অভিযোগ করিনি, নিরবে কাজ করেছি প্রতিনিয়ত। তবে অডিটের ফলাফল ভালো হলে মনে আর

কোনো কষ্ট থাকত না। ডেভিড হাওয়ার্ড এর ইসাবেল ম্যাডাম ও আরিফ স্যারের কাছে শিখেছি অনেক কিছু। ইসাবেল ম্যাডাম এর যেকোনো জিজ্ঞাসা এক/ দুই মেইলে শেষ করতে পারিনি কখনোই। অনেক ক্ষেত্রে ছয় মাস পর্যন্ত লেগেছে। ম্যাডামের কাছে শিখেছি– কীভাবে যেকোনো সমস্যার টেকসই সমাধান করতে হয়। আরিফ স্যারও আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন। ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের ছোট করতে চাই না।

এখনতো ফ্যাক্টরিকে আমার নিজের মনে হয়। নিজের বাড়িকে যেমন ভালোবাসি, তেমন ফ্যাক্টরিকেও। কখনো ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে কাজ করিনি, চাইলেই অফিস থেকে সময়মতো চলে যেতে পারতাম। কিন্তু মন আমাকে আটকিয়ে রাখতো অফিসে। দায়িত্ব নিয়েই কাজ করার চেষ্টা করেছি সব সময়। পূর্ব নির্ধারিত না থাকায় এমনও সময় গেছে, একদিনে তিনটি অডিট ফেস করতে হয়েছে। সময়ের সাথে এখন রপ্ত করতে পেরেছি কীভাবে শান্ত থেকে অডিট ফেস করা যায়। ২০১৬ সালে জেভিয়ার বিপ্লব দাস চলে যাওয়ার পর তানভীর সাহেবও এখানে কিছুদিন কাজ করেছেন এবং নানারকম সহযোগিতাও করেছেন। তানভির সাহেবও ট্রান্সফার হলে, ব্যাবিলনের সাথে আমার নতুন করে পথচলা শুরু হয়। সেই থেকে এখন পর্যন্ত একসাথে তিনটি দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে– অ্যাডমিন, এইচআর এবং কমপ্লায়েন্স। বর্তমানে শুধু অডিটই নয়, ফেস করতে হয় স্থানীয় কমিউনিটির নানারকম কার্যকলাপও। জাহাঙ্গীর আলম জয় স্যারের সার্বিক সহযোগিতা ও নির্দেশনা ছাড়া স্থানীয় কমিউনিটির কাজ সামাল দেয়া অসম্ভবই হতো আমার জন্য। স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞ আমি।

ব্যাবিলনে জয়েন করার পর শুনেছি আমাদের মাননীয় পরিচালকমণ্ডলী কখনো কারখানা পরিদর্শন করলে ফ্লোরের কমপ্লায়েন্স ভালোভাবে খেয়াল করেন। শুরু থেকেই এই ভয়টা ছিলো এবং এখনো আছে। এক ধরনের আতঙ্কে থাকতাম। যদি স্যাররা কখনো সমস্যা খুঁজে পায়! যদিও বিভিন্ন বায়ারদের আচরণবিধি, বাংলাদেশ শ্রম আইন ও ব্যাবিলনের আচরণবিধি অনুযায়ী সব সময় ফ্যাক্টরির কমপ্লায়েন্সকে আপডেট রাখতে চেষ্টা করেছি। তাই বড় ধরনের কোনো সমস্যা কেউ খুঁজে পাননি কোনোদিন। এক্ষেত্রে একটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয়। আমাদের ফ্যাক্টরি ইনচার্জ কাদির স্যার। আমাদের ফ্যাক্টরির কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে স্যারের কাছে যে কোনো সহযোগিতা চাইলে তিনি আমাকে তাৎক্ষণিক সমাধান/পরামর্শসহ সব ধরনের সহযোগিতা করেছেন। স্যারের প্রতি আমি বিশেষ কতৃজ্ঞ।

ব্যাবিলন গ্রুপের হেড অফিস ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ ভবনের আট তলায় হওয়াতে তখনকার সময়ের কর্পোরেট কমপ্লায়েন্স এর মাহমুদ স্যারের সাথে কাজের কারণে ছিলো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। যেকোনো সমস্যায় স্যারকে অবগত করলে তা সমাধানে স্যার সহযোগিতা করতেন খুব। আবার মাহমুদ স্যারও ব্যাবিলন গ্রুপের অন্য ফ্যাক্টরির বিভিন্ন অডিটের প্রয়োজনে এবং দ্রুত সময়ে কাজ করার জন্য আমার কাছে তৈরিকৃত বিভিন্ন ডকুমেন্টস

চাইতেন। আমি যত ব্যস্তই থাকতাম না কেন স্যারকে তাৎক্ষণিকভাবে ডকুমেন্টস পাঠাতাম। আবার আমার ফ্যাক্টরির প্রয়োজনেও আমি স্যার কিংবা অন্য ফ্যাক্টরির এইচআর ইনচার্জদের সাথে নথিপত্র বিনিময় করেছি অডিটের প্রয়োজনে। তুষার স্যারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। স্যারের কাছে সেফটি কমপ্লায়েন্স, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স এর কাজ শিখেছি। যে কোনো বিষয়ে স্যার খুব দ্রুত সমাধান দিতেন। এভাবে আমরা পুরো ব্যাবিলনে একটা পরিবার হিসেবে কাজ করেছি এবং এখন পর্যন্ত করে যাচ্ছি।

পোশাক শিল্পে ব্যাবিলনের পথচলা ১৯৮৬ সালে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ব্যাবিলন এগিয়ে যাচ্ছে। কারখানাগুলোর কার্যক্রম একটা সুষ্ঠ, সুন্দর নিয়মে পরিচালনা এবং ব্যাবিলনের ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে ব্যাবিলন গ্রুপে কর্পোরেট ও ফ্যাক্টরিতে একটি সুন্দর অর্গানোগ্রাম রয়েছে এবং তদানুযায়ী অত্যন্ত সুন্দরভাবে কোম্পানির কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে।

২০২০ সালটি পুরো বিশ্ববাসীর জন্য এক বিষময় বছর যেন! ভয়াল করোনার থাবায় পুরো বিশ্ব থমকে গিয়েছিলো। বিশ্বে অনেক কোম্পানি দেউলিয়াত্বের শিকার ও অনেক কর্মী কর্মহীন হয়ে পড়েছে। ব্যাবিলনের মালিকদের মহানুভবতা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের যোগ্য নেতৃত্বে আমাদের সেরকম পরিস্থিতির শিকার হতে হয়নি এখন পর্যন্ত। করোনাকালীন সময়ে অন্যান্য কোম্পানির মতো ব্যাবিলন গ্রুপের ব্যবসায়িক ক্ষতি হলেও আল্লাহর রহমতে ব্যাবিলন গ্রুপ টিকে আছে এবং থাকবে অনন্তকাল ধরে। আমাদের উচিত প্রত্যেকে যার যার স্থান থেকে নিজ দয়িত্ব সৎভাবে ও শতভাগ পালন করা, তবেই আমরা আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যের দিকে পৌঁছতে পারব।

প্রায় আট বছর হতে চললো। একটি স্বনামধন্য ব্রান্ডের কমপ্লায়েন্স প্রতিনিধি শারমিন ম্যাডামের সেই কথাটি এখনো আমার স্পষ্ট মনে পড়ে– ‘ব্যাবিলন একটা ব্রান্ড।’

আকুতির নিয়তি

আবু তালেব
প্রাক্তন সুপারভাইজার, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, রাস্তার পাশে সোডিয়াম লাইটগুলো জ্বলে উঠেছে। কৃত্রিম নিয়ন আলোতে মহাসড়কের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছি। আর মাত্র বিশ মিনিট হাঁটলেই গ্রামের বাড়ি মায়ের কোলে ফিরতে পারবো। মহাসড়কে বিদুৎ গতিতে যানবাহনগুলো ছুটে চলছে। এ যেন এক মহা অসুস্থ প্রতিযোগিতার মরণ খেলায় মেতেছে তারা। একটু কম বেশি হলেই ঝরে যেতে পারে প্রাণ। যাইহোক, এরকম থমথমে ও ভয়ানক পরিস্থিতিতে ছুটে চলেছি। একটু দূরেই লক্ষ্য করলাম এক বুড়ি মা লাঠি ভর দিয়ে হেঁটেই চলেছে এবং একা একা কি যেন বলছে। বয়সের ভারে সে কুঁজো হয়ে গেছে। আমি আমার হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলাম এবং বুড়ি মাকে ধরে ফেললাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, চাচি কোথায় যাবেন? এতক্ষণে তাকে রাস্তার ডেঞ্জার প্রান্ত থেকে সেভ জোনে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। আমার ডান হাত দিয়ে বুড়ি মার হাত ধরেছি, শরীরটা যথেষ্ট ক্ষীণ এবং কাঁপছিলো। ইতোমধ্যে বুড়ি মাকে অনেক প্রশ্ন করেছি কিন্তু জবাব একটাই– আমি ঐ লাইটের কাছে যাব, সেখানে আমার ছেলে থাকে। প্রায় পঞ্চাশ মিনিট এভাবে হাঁটার পর নিজেকে জনমানবশূন্য এক ভয়ঙ্কর পরিবেশে বুড়ি মার সাথে আবিষ্কার করলাম। আমার খুব ভয় হচ্ছিলো, তাই সঙ্গত কারণেই বুড়ি মার হাত ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। এরপর কিছুক্ষণ হেঁটে বাড়ির গেটে ঢুকতেই মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন এত দেরি হলো কেন? আমি মাথা নিচু করে মায়ের প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে আমার রুমে প্রবেশ করলাম। ফ্রেশ হতে না হতেই মায়ের চিরচেনা ডাক 'আবু খেতে আসো।' খাবার সামনে টেবিলে বসলেও মনের ভিতর বুড়ি মায়ের প্রতিচ্ছবি, আকুতি ও ব্যাকূলতা বিরাজ করছে। কিছুতেই অন্য চিন্তা করতে এবং স্বাভাবিক হতে পারছি না। কী খাবার খাচ্ছি সেটাও বুঝতে পারছি না। ২-৩ বার খাবার মুখে দিতেই একটা বিকট শব্দ এবং মানুষের হইহল্লার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমার মন তৎক্ষনাৎ চিৎকার দিয়ে বললো, বুড়ি মা হয়তো আর বেঁচে নেই। আমার শ্বাস-প্রশ্বাস বেড়ে গেলো, আমি অনেকটা বিচলিত হয়ে গেলাম। মা জিজ্ঞেস করলেন কী হয়েছে? আমি গতবারের ন্যায় এবারও মায়ের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দৌড়ে ছুটে চললাম দুর্ঘটনাস্থলে। অনেক মানুষ চারদিকে গোলাকার হয়ে ভিড় করছে, সবার চোখে মুখে আতঙ্ক আর কান্নার ছাপ। ইতোমধ্যে পুলিশ উপস্থিত হয়েছে। ভিড়ের মাঝে নিজেকে সামিল করে লক্ষ্য করলাম বুড়িমার রক্তাক্ত শরীর পড়ে আছে রাস্তার পাশেই। দুর্ঘটনা কবলিত যাত্রী পরিবহন বাসটিকে আটক করেছে পুলিশ। অনেকক্ষণ হতবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম! আমার চোখের কোণায় পানি ছলছল করছিলো। কাউকে কিছু না বলে স্বার্থপরের মতো এবারো প্রস্থান করলাম। এরপর প্রায় তিন দিন রাতে স্বাভাবিক

ঘুম হয়নি। মস্তিষ্কের ভিতরে শুধু কয়েকটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিলো কেন আমি বুড়ি মাকে বাসায় আনতে পারলাম না। কেনো আমি তাকে বাঁচাতে পারলাম না। তিন দিন পর যখন স্বাভাবিক হলাম তখন উত্তরটা খুঁজে পেলাম। সত্যিই বুড়িমার আকুতির আছে আমি হেরে গিয়েছিলাম। আকুতির নিয়তি তাকে পরপারে পৌঁছে দিয়েছে। এভাবে তার চলে যাওয়া আজও মনকে অস্থির করে তোলে, ভুলতে পারি না কিছুতেই। পরপারে ভালো থাকবেন বুড়ি মা।

সাদা পায়রা

আরিফ হোসেন
জুনিয়র ম্যানেজার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

ফজরের আজানের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় জাহিদের। মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখে সময় ভোর পাঁচটা বেজে বিশ মিনিট। আজ শুক্রবার, তাই অফিসে যাবার কোনো তাড়া নেই। মোবাইলটা বালিশের পাশে রেখে কাঁথাটা টেনে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দেয়। খুব আয়েশ করে ঘুমাবার চেষ্টায় দুচোখ বন্ধ করে। ঠিক তখনই মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে। স্ত্রী ফোন করেছে দেখেই বিরক্ত হয়ে ফোন কেটে দেয় জাহিদ। অন্য পাশে ফিরে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করে। আবারও ফোন বেজে ওঠে। না রিসিভ করা পর্যন্ত বিরক্ত করা থামাবে না মেয়েটা! খুব বিরক্তির সাথে ফোনটা রিসিভ করে জাহিদ।

– কী ব্যাপার, কী হয়েছে! এত সকালে বিরক্ত করছো কেন?
– তাড়াতাড়ি নামাজ পড়তে উঠেন, আজানের শব্দ পেয়েও কীভাবে যে ঘুমিয়ে থাকেন!
– উঠছি, তুমি রাখো। (প্রচণ্ড বিরক্তির সাথে বলে জাহিদ)
– ঘুমাবেন না কিন্তু, আমি দশ মিনিট পরে আবারও ফোন দিবো।

এবার আর না উঠে পারে না জাহিদ। মেসের সবাই এখনো ঘুমের দেশে। পাশের সিটের রাশেদ ভাই কী শান্তিতেই না ঘুমাচ্ছে। কেবল জাহিদেরই শান্তি নেই। নামাজ পড়া শেষে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় জাহিদ। পাঁচতলার বারান্দা থেকে ভোরের আকাশটাকে দারুণ লাগছে! চারপাশটা অদ্ভুত নীরব! হিম হিম ভাব চারপাশের নীরব পরিবেশের সাথে যেন একাত্মতা প্রকাশ করেছে। একঝাঁক সাদা পায়রাকে আকাশে উড়ে যেতে দেখে জাহিদ। বুকের ভেতর থেকে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার। একটা তীব্র কষ্ট যেন তার মনটাকে অস্থির করে তোলে। হঠাৎ আকাশটা কালো মেঘে ঢেকে যায়, হয়তোবা বৃষ্টি নামবে যে কোনো সময়। জাহিদের মনের আকাশেও এখন কালো মেঘেদের ঘনঘটা। বারান্দা থেকে রুমে চলে আসে সে। স্ত্রীকে এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়, নামাজ পড়া শেষ। কাঁথাটা মাথা পর্যন্ত টেনে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে, হয়তোবা এতক্ষণে বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছে। পাঁচতলা থেকে বৃষ্টির শব্দ শোনা যায় না, মাঝে মাঝে

মেঘের গর্জন শোনা যায় কিছুটা। জাহিদের গ্রামের বাড়ি হলে এ মুহূর্তে টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার ছন্দময় শব্দ ঘুম কেড়ে নিতো তার। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ খুব ভালো লাগে জাহিদের। ওই সময়টাতে জানালার পাশে বসে লেবু, কালোজিরা মিশ্রিত এক কাপ রং চা আর টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ। কী চমৎকার সময়গুলো হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে! মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়ানো সাদা পায়রার ঝাঁকের ছবি আবার তার মনে ভেসে উঠে। জাহিদ ফিরে যায় দশ বছর আগের স্মৃতিতে, যা সে কখনো আর স্মরণ করতে চায় না।

জাহিদ তখন অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। জাহিদের ছিলো এক ঝাঁক সাদা পায়রা। ওরা শুধুমাত্র পায়রাই ছিলো না, ওরা ছিলো জাহিদের সকল ভালোলাগার উৎস। ওদের সাথে সময় কাটাতে তার ভীষণ ভালো লাগতো। খুব ভোরে ওদের ঘরের দরজা খুলে দেয়া, বাসা পরিস্কার করা, ওদের জন্য খাবার তৈরি করা –এসব করতেই ওর ভার্সিটির সময় হয়ে যেত। তারপর তাড়াহুড়ো করে ভার্সিটির জন্য রেডি হতো আবার ভার্সিটি থেকে ফিরে প্রথমেই পায়রাগুলোর খোঁজ-খবর নিতো। নিজের গোসল, খাবার-দাবার কোনোকিছুর দিকেই তার কোনো খেয়াল ছিলো না। তার সকল চিন্তা-চেতনা, ভাবনাগুলো কেবল ওদের ঘিরেই ছিলো। ভার্সিটি থেকে ফেরার পর প্রথমে পায়রাগুলোকে খাবার দিত, তারপর নিজে খেত। বৃষ্টির দিনগুলোতে জাহিদ যেখানেই থাকতো, বাড়ি ছুটে চলে আসতো। যেন ওর পায়রাগুলো বৃষ্টিতে ভিজে না যায়। কী এক আশ্চর্য মায়ার টানে ওদের কাছে ছুটে আসতো জাহিদ। বাক বাকুম শব্দে পায়রাগুলো যখন সারা উঠোনময় ঘুরে বেড়াত, জাহিদ তখন মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকতো। বিকেলে পায়রাগুলো যখন ওদের বাড়ির ওপরের আকাশটাতে একসাথে দলবেঁধে উড়ে বেড়াত, তখন ভীষণ ভালো লাগতো জাহিদের। মুক্ত আকাশে ওদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ জাহিদের মনে এক আশ্চর্য মায়ার ইন্দ্রজাল তৈরি করতো যেন! কেবলই মুগ্ধ হয়ে পায়রার পালের দিকে তাকিয়ে থাকতো সে। এক অকৃত্রিম মায়া তৈরি হয়েছিলো ওদের জন্য, দিনদিন যা বেড়েই চলছিলো। পায়রাগুলোও যেন জাহিদকে চিনতো পারতো। খাওয়ানোর সময় জাহিদের কাঁধের ওপর গিয়ে বসতো ওরা। বাক বাকুম শব্দে যেন তারা জাহিদের সাথে কথা বলতো। পায়রাগুলোকে ঘিরেই ছিলো জাহিদের জগৎ। সারাক্ষণ পায়রাগুলোর কথা ভাবতো, কোনোটার অসুখ হলে জাহিদ অস্থির হয়ে যেত। নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়াতো কীভাবে সুস্থ হবে, কোন ঔষধ খাওয়াতে হবে। শহরে দূরের পশু হাসপাতালে কতবার ছুটে গেছে সে, তার কোনো হিসেব নেই। সন্ধ্যায় যখন পায়রাগুলো তাদের ঘরে ঢুকতো, জাহিদ তখন নিশ্চিন্ত মনে তার পড়ার টেবিলে বসতো। মাঝে মাঝে রাতেও ওদের ঘরগুলো চেক করতো পায়রাগুলো ঠিকমতো আছে কি না। তারপর অপেক্ষায় থাকতো ভোরের। ভোর হলেই ওদের ঘরের দরজা খোলার মধ্য দিয়েই জাহিদের প্রত্যেকটি দিন শুরু হতো। এভাবে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিলো বেশ। বন্ধুরা যখন দলবেধে কক্সবাজার কিংবা দূরে সুন্দর কোথাও ঘুরতে যেত, জাহিদ তখন যেতে চাইতো না। সে ভাবতো কোথাও গেলে ওর পায়রাগুলোকে কে দেখবে? কে পায়রাগুলোর ঠিকমতো যত্ন করবে? জাহিদের বাড়ির টিনের চালের সাথেই ছিলো পায়রাগুলোর বাসা।

চারটা বাসা খুব যত্ন করে বানিয়েছিলো সে। সেখানে ছিলো প্রায় একশত'র বেশি পায়রা। একদিন ভোরে জাহিদ লক্ষ্য করলো পায়রার সংখ্যা অনেক কম। প্রায় বিশ-পঁচিশটির মতো পায়রা নেই। তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। বাড়ির আশ-পাশসহ প্রায় পুরো গ্রামেই অনেক খোঁজাখুঁজি করলো কিন্তু তার পায়রাগুলো কোথাও খুঁজে পেল না জাহিদ। সারাদিন মনের কষ্টে সে খাওয়া-দাওয়া করতে পারলো না। পরিচিতজনেরা বললো, বিভিন্ন জায়গায় পায়রা চুরি হচ্ছে। হয়তোবা কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে। জাহিদ সারাদিন ভাবতে লাগলো কী করবে সে! ঐদিন রাতটা নির্ঘুম কাটিয়েছিলো জাহিদ এবং সারারাত ভেবেছে কীভাবে সে তার পায়রাগুলোকে চোরের হাত থেকে রক্ষা করবে। অবশেষে সে এক বুদ্ধি বের করলো। পায়রাগুলোর ঘরের সামনে তারের বেড়া সেট করে দিলো। ওই তারে রাতে বিদ্যুতের আর্থিং লাইন সংযুক্ত করে দেয় এবং সকালে পায়রাগুলোর ঘরের দরজা খোলার সময় লাইন অফ করে দেয়। ফলে পায়রা চুরির ঘটনা আর ঘটেনি।

আগামীকাল জাহিদের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পায়রাগুলোর যত্নের কোনো কমতি হয় না তবুও। সন্ধ্যায় ওদের ঘরে ঢুকিয়েই সে পড়াশুনায় ব্যস্ত হয়ে পরে। সেদিন গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করছিলো জাহিদ। হঠাৎ বাইরে অনেক আলো দেখতে পায়। পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকায় ঠিক বুঝতে পারে না কী হচ্ছে বাইরে, কেন এত আলো? যখন একটা পোড়া পোড়া গন্ধ নাকে আসে, কেমন যেন মাংস পোড়া গন্ধের মতো! তখন জাহিদ রুম থেকে বের হয়। পায়রার বাসাগুলোতে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পায় জাহিদ। 'আমার পায়রা পুড়ে গেল' –চিৎকার দিয়ে উঠে জাহিদ। বাড়ির অন্যান্য লোকজনও ততক্ষণে বুঝতে পারে আগুন লেগেছে। সবাই বাইরে বেরিয়ে আসে। পায়রার ঘরের কাঠ পোড়ার শব্দ এবং জীবন্ত পায়রাগুলো আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টায় অনবরত ডানা ঝাপটানোর শব্দে চারপাশটা ভরে গেছে যেন। আগুনের উত্তাপে কেউ কাছে যেতে পারছিলো না, তবু জাহিদ চিৎকার করে 'আমার পায়রা, আমার পায়রা' বলে আগুন লাগা ঘর থেকে পায়রাগুলোকে বের করতে গেলে লোকজন তাকে আটকে রাখে। পায়রার বাসার চারপাশে সেট করা তারের আর্থিং লাইন বন্ধ করে দেয় কেউ একজন। সবার প্রচেষ্টায় পুকুর থেকে বালতি দিয়ে পানি ছিটানোর মাধ্যমে একসময় আগুন নিভিয়ে ফেলতে সক্ষম হয় লোকজন। কিন্তু ততক্ষণে পুড়ে প্রায় ছাই হয়ে যায় সবগুলো পায়রা। একটি পায়রা কোনোভাবে বেরিয়ে জাহিদের সামনে পড়ে। প্রায় অর্ধেক পুড়ে যাওয়া পায়রাটি জাহিদের হাতের ওপর ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে একসময় মারা যায়। লোকজন বলাবলি করছিলো, হয়তো আর্থিং এর কারণে কোনোভাবে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লাগতে পারে। জাহিদ কেমন যেন অদ্ভুত রকমের নিশ্চুপ তখন। যেন অধিক শোকে পাথর হয়ে গেছে সে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলো পুড়ে যাওয়া পায়রাগুলোর দিকে। জাহিদের দুগালে শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুর দাগ তখনো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো।

আর ভাবতে পারে না জাহিদ, ভাবতেও চায় না সে তার এ দুর্বিসহ কষ্টের কথা। তাই এখন

কোনো পায়রার পালের দিকে তাকাতে পারে না জাহিদ। আজ ভোরে কেন যে এই পায়রার ঝাঁকগুলোকে দেখতে পেল সে! কখন যে তার দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়া অশ্রুতে বালিশ ভিজে গেছে, টেরই পায়নি জাহিদ! ঠিক সেদিন যেমন তার হৃদয় ভিজেছিলো আগুনের লেলিহান শিখার উত্তাপে নিরীহ কিছু প্রাণের আর্তচিৎকার ও ডানা ঝাপটানোর তীব্র কষ্টের অশ্রু দিয়ে।

আবারও জাহিদের মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে। দুচোখের অশ্রু মুছে মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়েই দেখে বন্ধু শরিফ ফোন দিয়েছে।
– কীরে, এত সকালে! কী হয়েছে তোর? (জিজ্ঞেস করে জাহিদ)
– তার আগে বল, তোর কী হয়েছে? তোর কণ্ঠটা কেমন যেন ভারি ভারি লাগছে। মনে হচ্ছে যেন কান্না করছিস তুই। শোন, অন্য কোনো প্ল্যান থাকলে বাদ দে, চলে আয় তিনশ ফিটে, তোর জন্য একটা বড়শি রেডি করে রেখেছি। আজ আমরা একসাথে মাছ ধরবো। (এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে শরিফ)
– তুই আসলেই একটা পাগল! বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে না? এই বৃষ্টির মধ্যে কীভাবে যাব?
– তুই হাসালি আমাকে, বৃষ্টি তোর জন্য কোনো সমস্যা? চলে আয় তাড়াতাড়ি, আমি অপেক্ষা করছি। তুই আসার পর আমরা একসাথে আজ মাছ ধরবো। ঠিক আছে বলে ফোনটা রেখে দেয় জাহিদ। কী হচ্ছে আজ? ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে হচ্ছে! ভোরে স্ত্রী বিরক্ত করলো আর এখন শরিফ! জাহিদের মুহূর্তেই মনে পড়ে যায় ছেলেবেলার পাগলামোগুলো! ১০২ ডিগ্রি জ্বর নিয়েও জাহিদ তার বন্ধু শরিফের সাথে সাইকেলে ডাবলিং করে মাইলের পর মাইল পথ পাড়ি দিয়েছে। অকারণে সারারাত গল্প করে কাটিয়েছে, অনেক দূরের কোনো এক অজানা গ্রামে প্রয়োজন ছাড়াই চলে যেত ওরা। মন যখন যা চেয়েছে তাই করেছে ওরা। মনে মনে হাসে জাহিদ। শত কষ্টের মাঝেও এখন হাসতে পারে জাহিদ। কারণ কষ্টগুলো মনে রাখতে নেই, কষ্টগুলো ভুলে যেতে হয়। নিজের জন্য না হলেও অন্যের জন্য, ভালো থাকার জন্য এবং সুন্দর এ পৃথিবীটার জন্য সব ভুলতে হয়। শরীরটার বয়স বেড়েছে অনেকটাই, নানারকম রোগ ব্যাধিও আস্তানা গেড়েছে শরীরে। তবে মনের বয়স বাড়েনি একটুও, যেন এখনো সুইট সিক্সটিন। যদিও চারপাশে এখনো মহামারির আতঙ্ক রয়েছে! নিজের জন্য না হলেও অন্যদের জন্য, বন্ধু শরিফের জন্য কিংবা সুন্দর একটি পৃথিবীর জন্য জাহিদ তৈরি হয়ে নেয়– মুখে মাস্ক, পকেটে হ্যান্ড স্যানিটাইজারটা নিতেও ভুলে না। রেইনকোটটা গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে পরে জাহিদ। একঝাঁক সাদা পায়রাকে আবারও উড়ে যেতে দেখে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে জাহিদ। হয়তোবা ওদের নীড়ে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছে অন্য কোনো এক জাহিদ। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, যেন আকাশটাও জাহিদের মনের কষ্ট অনুভব করতে পেরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তবে জাহিদের চোখেমুখে ভোরের আলোর মতো সোনালি স্বপ্নের ঝিকিমিকি...

এসো নামাজ পড়ি

মো. জসিম উদ্দিন (জীবন)
কাটিং সহকারী, কাটিং সেকশন
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা
নামাজ পড়তে যাই,
রাস্তা ঘাটে বসে থেকে
কোনো লাভ নাই।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লে
ভালো হবে মন,
এসো আমরা নামাজ পড়ে
ধন্য করি জীবন।

নামাজ পড়ে জীবন মোরা
ধন্য করি ভাই,
নামাজ ছাড়া পরকালে
পাবো না তো ঠাঁই।

নামাজ মোদের চলার সাথী
জান্নাতেরও চাবি,
আমরা সবাই নামাজ পড়বো
এটাই আমার দাবি।

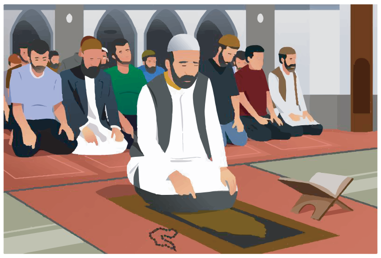

জীবন মোদের পার পাবে না
পরকালে ভাই,
এসো আমরা সবাই মিলে
নামাজ পড়তে যাই।

নামাজ পড়ে করবো দূর
সকল পাপ আর গোনাহ,
নামাজ পড়লে ক্ষমা করবেন
আল্লাহ রাব্বানা।

আজকে আছি কালকে নাই
দুনিয়াদারির ঘরে,
সুখের জীবন গড়বো মোরা
নামাজ পড়ে পড়ে।

পিকনিকে

মো. আমিনুল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী, সিকিউরিটি সেকশন
অবনী টেক্সটাইলস লিমিটেড

খাঁচার পাখি উড়াল দিবে
পাখনা মেলিয়া।
মনের সুখে গাইবে রে গান
সুরে সুর মিলাইয়া।

কেউবা গাইছে গানের কলি
স্টেজেতে আসি।
কেউবা সুরে মিলাইছে সুর
পাশে তাহার বসি।

কেউবা নাচছে স্টেজে আসি
কোমর দোলাইয়া।
তাইনা দেখে আনন্দেতে
সবে উঠেছে মাতিয়া।

লটারিতে কাটছে টিকিট
ক'টি টাকা দিয়া।
ড্র শেষে পাইয়া ফ্রিজ
উঠিল নাচিয়া।

হরেক রকম খাই যে খানা
পিকনিকেতে আসি।
শ্রমিক, স্যার, ম্যানেজার
একসাথেতে বসি।

মালিকগণ মোদের সাথে
কয় যে মনের কথা।
সেই কথা শুনিয়া দূর হয়
মনের যত ব্যথা।

মালিক শ্রমিক নাই ভেদাভেদ
পিকনিকেরও দিনে।
মনের সুখে সাজবো মোরা
এই তো আশা মনে।

বৎসরে একটি দিন পিকনিকেতে যাই
সেই দিনেতে সবে মিলে আনন্দে কাটাই
এমনি দিন প্রতি বছর যেন মোদের আসে
এমনি কামনা করি মালিকগণের কাছে।

ব্যাবিলন

মো. ফিরোজ হাসান
মেডিকেল সহকারী, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
জুনিপার এমব্রয়ডারিজ লিমিটেড

ব্যাবিলন তুমি
এক বুক ভালোবাসার নাম,
ব্যাবিলন তুমি
স্বপ্ন পূরণের অন্যতম এক জলন্ত প্রমাণ।

ব্যাবিলন তুমি
সফলতার শীর্ষে অবস্থান,
ব্যাবিলন তুমি
দুর্দিনে পাশে থাকার অঙ্গিকার।
ব্যাবিলন তুমি
সহানুভূতিতে করেছো শীর্ষস্থান।

ব্যাবিলন তুমি
মায়াঘেরা আমাদের এক পরিবার।
ব্যাবিলন তুমি
রাখো না ছোট বড় ব্যবধান

ব্যাবিলন তুমি
পাশে ছিলে, থাকবে পাশে
এই আমাদের আহ্বান।

রক্ত নদীর ধারা

মো. ছাদিকুল ইসলাম
সহকারী অপারেটর, অটো কার্টন
ব্যাবিলন ট্রিমস লিমিটেড

লাল সবুজের দেশটা আমার
রক্ত দিয়ে কেনা।
৭১ এ জীবন দিলো হাজার মুক্তিসেনা
জীবন দিলো রাখাল ছেলে
বাংলা ভূমির তরে,
পারেনি খেতে দুধের শিশু
ক্ষুধায় গিয়েছে মরে।
মুক্তিসেনারা বুকে বাঁধে,
পাক সেনাদের গুলি,
বুকের রক্তে লাল হয়ে যায়
বাংলা ভূমির ধুলি
হাজার মানুষ পালিয়ে গেল
হাজারো গিয়েছে মারা,
পদ্মা, মেঘনায় বইতে ছিলো
রক্ত নদীর ধারা।
পুড়লো কত ঘর বাড়ি আর
পুড়লো কত শস্য
হাল ছাড়েনি তবুও তারা
বুকে ছিলো সাহস অদম্য।
তবুও যুদ্ধ করে এ দেশটাকে
স্বাধীন করলো যারা,
তারা মোদের বাংলা মায়ের
সোনার সন্তানেরা।

ছন্দ

মোছা. মুন্নি আক্তার ময়না
প্রাক্তন জেনারেল অপারেটর, সুইং সেকশন
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

সাজিয়েছি তোমার ছবি রজনীগন্ধা ফুলে
তুমি কি রাগ করেছো গোলাপ দেয়নি বলে
তুমি তো বন্ধু আমার গোলাপের চেয়ে দামি
তাইতো তোমায় সব সময় মিস করি আমি।

একা একা সারাক্ষণ পথ চেয়ে থাকি
কল্পনাতে শুধু তারি ছবি আঁকি
বর্ষার কাব্য লাগে না যে ভালো
কেন তোমাকে বারবার মনে পড়ে বলো।

বন্ধু যদি হও মেঘ এর মতো
দূরে যেতে দেবো নাতো
বন্ধু যদি হও পাখির মতো
উড়ে যেতে দিবো নাতো
কি করে বোঝাবো তোমায়
মিস করছি কতো।

মনে পড়ে তোমাকে যখন
থাকি নিরবে
ভাবি শুধু তোমাকে
সব সময় অনুভবে
স্বপ্ন দেখি তোমাকে
চোখের প্রতি পলকে
আপন ভাবি তোমাকে
নিঃশ্বাসে ও বিশ্বাসে।

স্বার্থ

মারুফা আক্তার
জুনিয়র কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি সেকশন
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

বন্ধু বলো, বান্ধব বলো, কেউ কারো নয়
স্বার্থের কাছে পৃথিবী বড় অসহায়।

মন বলো, বিবেক বলো, কেউ ছোট নয়,
দুজন দুজনের চেয়ে বড় হতে চায়।

মরণ বলো, ত্যাগ বলো, কোনোটা মুক্তির নয়,
ধৈর্য্য-শৌর্য হলো এর একমাত্র উপায়।

সত্য কী অদ্ভুত এ জীবন
কখনো হাসির পূজারি
আবার কখনো কান্নার লুকোচুরি।

কখনো আবেগ ভরা মন,
আবার কখনো বিবেকের কাছে হেরে যায় এ জীবন।

করোনা ভাইরাস

মো. বাপ্পি মোড়ল
সিনিয়র কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি কন্ট্রোল
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

আল্লাহ তুমি দয়ার সাগর
দয়া তোমার মনে
দয়া করো মানুষ জাতির
পানি চোখের কোণে।

সবাই মিলে হাত তুলেছে
তোমার দয়া চায়
করোনা ভাইরাস এসেছে ভবে
মরছে অনেক মানুষ।

ভয়ে আরো অনেক মানুষ
হয়ে যাচ্ছে বেহুঁশ
জানি প্রভু সবকিছু যে
তোমার লীলাখেলা।

তাইতো তোমায় বলছি মোরা
করছি নাতে হেলা
তোমার বান্দার চোখে পানি
সবাই দিশেহারা।

রক্ষা করার মতো জানি
নেইতো তুমি ছাড়া
এবারের মতো করো ক্ষমা
আমরা দিশেহারা।

অঙ্কনেঃ ফারিহা নুজহাত,
মেয়ে (মো. মহসীন, গ্রুপ জিএম, অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স/ ট্রেজারি, ব্যাবিলন গ্রুপ)

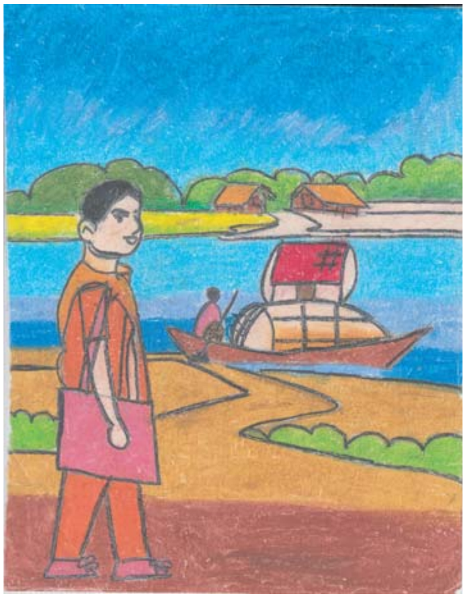

অঙ্কনেঃ আফরাহা মুনতাহা,
মেয়ে (মো. আনাসুল হক, গ্রুপ জিএম, কমার্শিয়াল অ্যান্ড লজিস্টিকস, ব্যাবিলন গ্রুপ)

অঙ্কনেঃ মো. ওয়াইস আহসান,
ছেলে (মো. আনাসুল হক, গ্রুপ জিএম, কমার্শিয়াল অ্যান্ড লজিস্টিকস, ব্যাবিলন গ্রুপ)

অঙ্কনেঃ সুমাইয়া (তুবা), চতুর্থ শ্রেণি
মেয়ে (মো. আবু তৌহিদ, ডেপুটি ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, অবনী নীট ওয়্যার লিঃ)

PHOTO ALBUM

Honorable chief guest renowned writer Mr. Anisul Hoque, Editor of Kishor Alo, Two Directors and the Group CEO of Babylon were in a festive moment of unwrapping ceremony of 14th issue of Babylon Kathokata in 2019.

Babylon team led by Babylon Agro and Dairy Ltd. distributed warm clothes amongst the children of Panchagarh district in December 2020.

Honorable chief guest Professor Dr. Md. Nazrul Islam, former Vice Chancellor, BSMMU (Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University), Two Directors and the Group CEO of Babylon Group, the scholars were seen in Babylon Scholarship Program 2019.

The female corporate team members along with the female workers celebrated "International Women's Day-2020" at the corporate office of Babylon Group.

The Honorable Board of Directors, Group CEO, Group CFO, Finance Controllers and all budget owners were seen in Annual Business Plan 2020 with a slogan "Towards a sustainable journey of an enviable growth".

HR team members of Babylon Group were seen in a photo frame at HR Dayout in Manikganj 2019.

Aboni Knit Wear Ltd. (One of the sister concerns of Babylon Group) is celebrating its 18th anniversary in 2020.

Babylon Agri-business team with the high officials of Babylon Group in front of Hotel Golden Hill at Cox's Bazar after the successful completion of the annual event 'Brainwave-2000'

Aquaculture
by BABYLON
Services Through Technology
Farm and Farmer are Priority
We are offering ,
» Bio-Securitry Products
» Nutritional Products
» Feeds (Nursery)
BABYLON
Spirit of Ethical Business | Since 1986

Corporate Office:

2-B/1, Darussalam Road, Mirpur, Dhaka-1216, Bangladesh.

Tel : 9023495-6, 8034266, 9023460, 9023462-3, 9015165 (Off)
9010533, 9007175 (Fac)

Fax : 880-2-8032949

E-mail: babylon@babylon-bd.com

Web : www.babylongroup.com